দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

বিজেপি-বিরোধীরাও মমতাকে বিপজ্জনক ভাবছে : পৃ- ১২

ত্রিপুরায় বামবিরোধী শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠছে বিজেপি : পৃ- ১৬

৬৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ৮ মে ২০১৭।। ২৪ বৈশাখ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

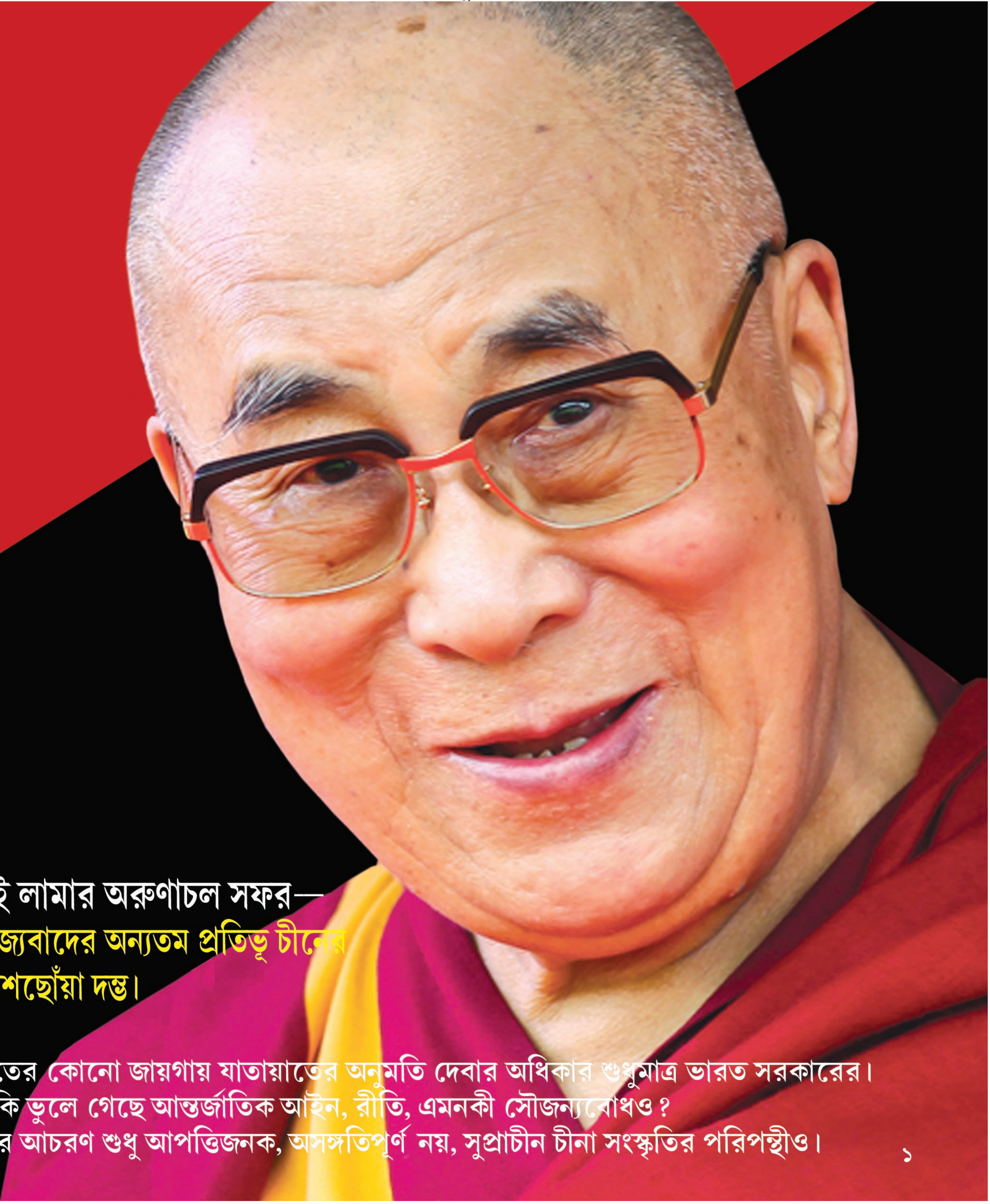

দলাই লামার অরুণাচল সফর—
সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিভূ চীনের আকাশছোঁয়া দম্ভ।

ভারতের কোনো জায়গায় যাতায়াতের অনুমতি দেবার অধিকার শুধুমাত্র ভারত সরকারের।
চীন কি ভুলে গেছে আন্তর্জাতিক আইন, রীতি, এমনকী সৌজন্যবোধও?
চীনের আচরণ শুধু আপত্তিজনক, অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, সুপ্রাচীন চীনা সংস্কৃতির পরিপন্থীও।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ২৪ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৮ মে - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

মিথ্যাচারের রাজনীতি করে সিপিএম মুছে গেছে, তৃণমূলও মুছে যাবে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : সগর্বে বলো 'দিদি' হিন্দু □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

বিজেপি বিরোধীরাও মমতাকে বিপজ্জনক ভাবছে □ সাধন কুমার পাল □ ১২

গণতন্ত্রের পোশাকে একনায়কতন্ত্র □ অমলেশ মিশ্র □ ১৪

ত্রিপুরার বামবিরোধী শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠছে বিজেপি □ ধর্মানন্দ দেব □ ১৬

দলাই লামার তাওয়াং সফরে চীনের হুমকি □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ১৯

দোসর পাকিস্তান তবু নিঃসঙ্গ চীন □ প্রণয় রায় □ ২১

প্রসঙ্গ দলাই লামা : চীন ভারতের কী ক্ষতি করতে পারে □ ২৩

মমতার গুহায় অমিতের গর্জন □ ২৪-২৬

২০১৯-এর লোকসভা মোদীর জন্যই সংরক্ষিত □ চেতন ভগত □ ২৭

গৌতম বুদ্ধের শেষ দিনগুলি □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ৩১

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র □ রূপশ্রী দত্ত □ ৩৩

অঙ্গনা : অন্নের অপচয় বন্ধ করতে পারেন মহিলারা □ সুতপা বসাক ভড় □ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

এই সময় : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯ □ ভাবনা-চিন্তা : ৩০ □ অন্যরকম : ৩৫ □ খেলা : ৩৭ □ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ স্মৃতিচারণা : ৪১-৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এই সময় এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ— প্রত্যেকেই দেশ-কাল-সমাজের মূল স্রোতটিকে পরিপুষ্ট করে তুলতে স্বতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু সত্তরের দশকের পর বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে এক সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রতিভূ হয়ে উঠলেন। একাধিক বাজারি সংবাদপত্রকে হাতিয়ার করে কায়েম করলেন মাফিয়াগিরি। সেই দুঃসময় এখনও বর্তমান। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় আলোচ্য বিষয়— এই সময় এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী। লিখেছেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ড. জিষ্ণু বসু এবং ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই

ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

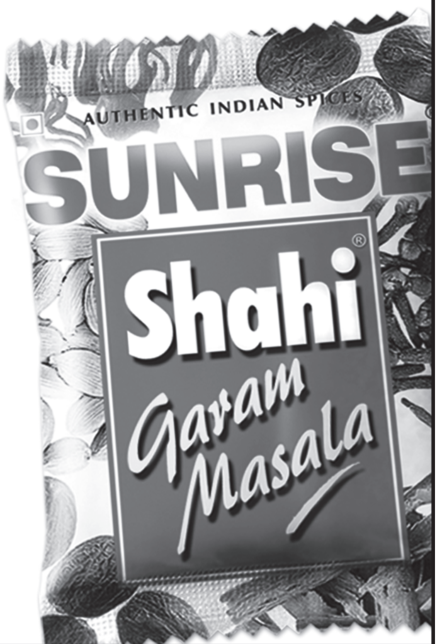

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তালাক ও নারীর মর্যাদা

কন্নড় দার্শনিক বসবেশ্বর জয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রতি দিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের ক্ষমতায়ণ প্রসঙ্গে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিন তালাক প্রসঙ্গে তাঁহার আশা যে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের মানুষেরা বিশেষত প্রবুদ্ধজনেরা আগাইয়া আসিবেন এবং বিষয়টি লইয়া গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করিবেন। মুসলমান সমাজের কল্যাণের কারণেই তিন তালাকের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানো প্রয়োজন। যদি তাঁহারা এই কাজটি করিতে পারেন তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে অন্যদের টীকা-টিপ্পনী বা তথাকথিত রাজনীতিকরণের প্রশ্নই উঠিবে না। প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলিয়াছেন যে যখন রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নিজের অভিমত প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সমাজের একাংশই বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই কথা ঠিক যে যখন কোনো সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়, তখন প্রথমে সেই সমাজের ভিতর হইতেই ইহার বিরোধিতা শুরু হয়। কিন্তু সময় যত আগাইয়া চলে, এই বিরোধিতাও ক্রমশ ফিকা হইয়া যায়। তিন তালাকের প্রসঙ্গেও ইহা হইতে পারে যদি মুসলমান সমাজের লোকেরা নিজেরাই মহিলাদের প্রতারণাকারী এই কুপ্রথা অবসানের জন্য রুখিয়া দাঁড়ান। এই কুপ্রথাকে শরিয়তের দোহাই দিয়া যাঁহারা সমর্থন করিতে ইচ্ছুক তাহারা কখনও মহিলাদের হিতৈষী হইতে পারেন না। মুসলমান সমাজের মহিলারাই তিন তালাকের বিরুদ্ধে যেভাবে ক্রমশ সোচ্চার হইতেছেন, তাহা তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না। তিন তালাকের প্রসঙ্গে মৌলানা, মৌলবি এবং তাঁহাদের সমর্থকদের ভূমিকা অনেকটা রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারের প্রস্তাবের বিরোধিতাকারীদের মতোই।

নিজেদের সমাজের মহিলাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য মুসলমান সমাজের যেমন দায়িত্ব রহিয়াছে তেমনই অন্য সমাজেরও এইরূপ দায়িত্ব রহিয়াছে। তাহাদেরও দেখিতে হইবে কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় কারণে নিজেদের সমাজের মহিলারা উপেক্ষিত হইতেছেন কিনা। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রথমত এই কারণে দেওয়ার প্রয়োজন কেননা ভারতে মহিলাদের প্রতি অবিচারের প্রতিরোধে অনেক কাজ করা হইলেও এখনও কিছু বাকি রহিয়াছে। কোনো সমাজই এখনও এমন দাবি করিতে পারিবে না যে তাহাদের সমাজে মহিলাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে সকল পথই প্রশস্ত, তাহাদের প্রতি কোনো উপেক্ষা হইতেছে না। আমাদের দেশে মহিলাদের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা শুধু গৃহের মধ্যেই সীমিত রাখিলে চলিবে না, সর্বজনীন ক্ষেত্রেও তাহাদের এই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। গৃহ-পরিবারের বাইরে মহিলারা বিভিন্ন বাধার মুখোমুখি হইতেছেন—এই দৃশ্য আমাদের নজরে আসিতেছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয়টি হইল সর্বজনীন ক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষার অভাব। বিষয়টি আরও বেশি উদ্বেগের যে মহিলাদের সুরক্ষার প্রশ্নটি ক্রমশই বাড়িতেছে। যে দেশে নারীকে পূজনীয়ার দৃষ্টিতে দেখিবার পরম্পরা, সেই দেশে আজ এই দৃষ্টিভঙ্গির অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহার অন্যতম কারণ, মহিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখিবার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের সব ক্ষেত্রের মানুষ যদি আগাইয়া আসেন, তবেই মঙ্গল। তাহাতেই দেশের নারী সমাজকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইবে।

সুভাষিতম্

রাষ্ট্রস্য সুদৃঢ়া শক্তিঃ সমাজস্য চ ধারিণী।
ভারতে সংস্কৃতে নারী মাতা নারায়ণী সদা।।

ভারতের নারী শক্তির স্রোত যা রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করে এবং সমাজকে ধারণ করে আছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে মাতা সর্বদা নারায়ণীর মতো পূজ্য।

নারদের এফআইআর-এ অভিষেকের নাম, চিন্তা বাড়ছে তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো প্রাথমিক অনুসন্ধানের শেষে ১৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে সিবিআই। এফআইআর হয়েছে ১২ জন তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এরা হলেন মকুল রায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায়, ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শুভেন্দু অধিকারী, ইকবাল আহমেদ, সুলতান আহমেদ, অপরূপা

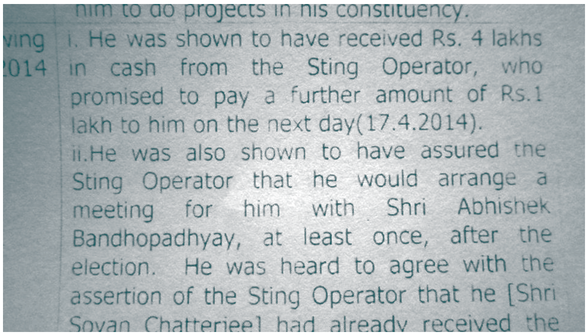

him to do projects in his constituency.

i. He was shown to have received Rs. 4 lakhs in cash from the Sting Operator, who promised to pay a further amount of Rs.1 lakh to him on the next day(17.4.2014).

ii.He was also shown to have assured the Sting Operator that he would arrange a meeting for him with Shri Abhishek Bandhopadhyay, at least once, after the election. He was heard to agree with the assertion of the Sting Operator that he [Shri Sovan Chatterjee] had already received the

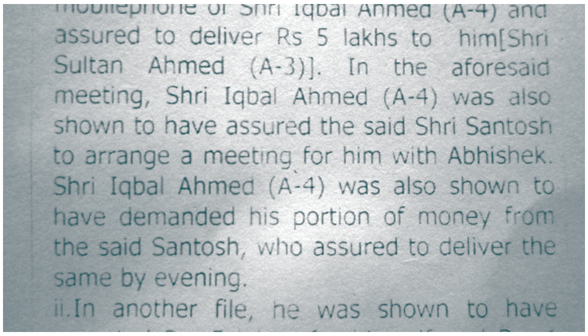

mobilephone of Shri Iqbal Ahmed (A-4) and assured to deliver Rs 5 lakhs to him[Shri Sultan Ahmed (A-3)]. In the aforesaid meeting, Shri Iqbal Ahmed (A-4) was also shown to have assured the said Shri Santosh to arrange a meeting for him with Abhishek. Shri Iqbal Ahmed (A-4) was also shown to have demanded his portion of money from the said Santosh, who assured to deliver the same by evening.

ii.In another file, he was shown to have

পোদ্দার, প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শুধু ভিডিও নয়, নারদ টিভির অডিও থেকেও তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতার নাম পেয়েছে সিবিআই। তাঁদেরও নোটিশ পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

আর এই তালিকায় রয়েছেন স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সিবিআই যে এফআইআর করেছে তাতে একবার দুবার নয়, ছ-বার নাম রয়েছে শ্রীমান অভিষেকের। এফআইআর-এর ৭ ও ৮ নম্বর পাতায় অভিষেকের নামোল্লেখ রয়েছে। না, তাঁর পরিচয় উল্লেখ করা নেই। কিন্তু তিনি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় ভাইপো, তৃণমূল কংগ্রেসের স্বঘোষিত যুবরাজ তথা ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃণমূল কংগ্রেসের গত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মোটামুটি যা আঁচ পাওয়া গিয়েছে তাতে তিনিই আগামীদিনে দলের কাণ্ডারি। ইতিমধ্যেই তিনি দলের সিনিয়র নেতাদের নির্দেশাবলী দিতে শুরু করেছেন। রীতিমতো যুব সভাপতির প্যাডে নির্দেশ যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মূল দলের কোনো পদে তিনি নেই। তাই নিয়ম ভেঙেও তিনি সব কিছু করছেন। কারণ, দলে এর প্রতিবাদ করার জায়গায় কেউ নেই। শোনা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীও ঘোষণা করা হতে পারে। কিন্তু এত কিছু করেও কি আটকানো যাবে! নারদের ফুটেজ থেকে সিবিআই যে বারবার জানতে পেরেছে তাঁর নাম। ঘুষকাণ্ডে তিনিও রয়েছেন বলে দাবি সিবিআইয়ের। অনেকে বলতে পারেন সিবিআইয়ের করা এফআইআর-এ অভিষেক নামের ছ-বার উল্লেখ থাকলেও তাঁর কোনো পরিচয় লেখা নেই। শুধু বলা রয়েছে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী নেতা। কিন্তু তেমন আর কোনো অভিষেক তো নেই দিদির দলে। এক ভাইপো ছাড়া আর কোনো অভিষেককে তো তিনি অভিষিক্ত করেননি। তাই দিদির পরিবারেই চিন্তা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই অভিযুক্ত ১২ নেতাকে বাঁচানোর চেষ্টা বন্ধ করে দিয়ে আপাতত ভাইপোকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

ইতিমধ্যে এফআইআর-এ নাম থাকা ১২ নেতাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে জেরা করতে পারে সে ব্যাপারে কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে মুকুল রায়ের। তিনি অতীতে জেরার মুখে পড়েছেন। তাপস পাল, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও কিছু কিছু টিপস নেওয়া হয়েছে। সকলকে বলা হয়েছে— যা খুশি বল কিন্তু অভিষেকের পরিচয় বলা যাবে না। শুধু অভিষেক নয়, তাঁর দুই ব্যবসায়ী বন্ধুকেও ডাকবে সিবিআই। তাঁদেরও দল বলেছে যুবরাজের নাম বলা যাবে না। কিন্তু সত্যিই কি কারও মুখ বন্ধ রাখা যাবে। নিজে বাঁচতে কেউ ভাইপোর নাম বলে দেবে না তো! চিন্তায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া পোড় খাওয়া সিবিআই গোয়েন্দারা কি খুঁজে বের করে ফেলবে না! অভিষেক যাওয়া মানে তো আরও নাম জড়াবে! অনেক চিন্তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে এখন কান টানলে মাথা চলে যাওয়ার ভয় কাজ করছে।

‘প্রিভেন্ট অব মানি ল্যান্ডারিং’ আইন প্রয়োগ হলে নারদার অভিযুক্তরা আরও ঝামেলায় পড়বেন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সিবিআই-এর থেকে ইডিই এখন নারদা হুলবিদ্ধদের বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কাগজে কলমে ইতিমধ্যে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে তাঁরা টাকা অবশ্যই নিয়েছিলেন তবে অনুদান হিসেবে। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেই ভেতরে ভেতরে চাপা আতঙ্কে ব্যক্তিগত ভাবে মাতব্বর সব উকিলদের থেকে পরামর্শ চাইতে গেছেন। ‘Money Landering Case’ -এ ফেঁসে গেলে কী পরিণতি হতে পারে তা বুঝতেই এই চেষ্টা। অভিযুক্তদের এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ইডি আধিকারিকরা এখন নির্বাচনী তহবিলের তদন্ত শুরু করতে পারেন। অভিযুক্তদের দাবি মতো নির্দিষ্ট অর্থ অডিট করা ২০১৪ সালের নির্বাচনী তহবিলে যথাযথভাবে জমা পড়েছে কিনা সেটাই তাঁরা পরীক্ষা করবেন। এ ক্ষেত্রে যাঁরা তাদের দাবির স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ অনুদানের অর্থ নির্দিষ্টভাবে দলীয় নির্বাচনী তহবিলেই যে জমা পড়েছে তা প্রমাণ করতে পারবেন না তাদের ক্ষেত্রে খোঁজ শুরু হবে টাকাটা কোথায় গেল অর্থাৎ কোথায় গিয়ে ঢুকল।

পিএমএলএ-এর ক্ষমতা অনুযায়ী তদান্তকারীরা অভিযুক্তের ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র প্রয়োজনে দাখিলাকৃত আয়ের তথ্যের সঙ্গে অর্জিত সম্পদ মূল্যের (Asset Value) যদি সামঞ্জস্য না থাকে তা হলে তার কৈফিয়ত চাইতে পারেন। এই সব সম্ভাব্য বিপদ সঙ্কেতের জন্য ইডি'র তদন্ত অভিযুক্তদের পক্ষে নানা অনিশ্চিত সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের আশঙ্কা টাকার শেষ গন্তব্য খোঁজার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ‘ত্রিনেত্র’ নামের যে কোম্পানির সঙ্গে দলের সম্পর্ক সামনে এসেছে— ইডি-র নতুন তদন্ত আবার তাকেও খুঁচিয়ে তুলতে পারে।

এই ‘ত্রিনেত্র’ আসলে একটি সেল (জালি বা জালিয়াতি) কোম্পানি যেটি খোলার উদ্দেশ্যই ছিল রিয়েল এস্টেট থেকে আদায় করা টাকা এই কোম্পানি ঘুরে নির্বাচনের সময় তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। হয়েছিলও তাই। তৃণমূল নেতা মুকুল রায় অতীতে এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তদন্তে এ প্রশ্নও উঠবে ম্যাথু স্যামুয়েল তৃণমূল নেতাদের ও পুলিশ আধিকারিককে দেওয়ার টাকা কোথা থেকে পেয়েছিলেন। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়ান অতীতে সংসদে বলেছেন, ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে এই টাকা দুবাই থেকে এসেছিল। অন্যদিকে ম্যাথু দুবাই যোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও ও ব্রায়ান বলেছেন, তাঁর হাতে বিদেশে ৭টি ফোনালাপের তথ্য আছে।

ইডি কর্তারা জানাচ্ছেন এই হুল কাণ্ডের গোটা প্রক্রিয়াতেই টাকার জোগান কীভাবে হয়েছিল তার হদিশ পেতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তির সঙ্গেই যোগাযোগ করবেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাথু ইতিমধ্যেই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন— তিনি কে. ডি. সিং-এর সংস্থা অ্যালকেমিস্ট গ্রুপের কাছ থেকে পাওয়া টাকাই জনপ্রতিনিধিদের বিতরণ করেছিলেন। গোয়েন্দারা এবার স্যামুয়েলকে তাঁর তথ্যের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী হুল কাণ্ডের টাকা দেওয়া-নেওয়ার পর্বটি প্রমাণের ক্ষেত্রে তুলনায় সরল কেননা টাকা নেওয়ার প্রমাণস্বরূপ ম্যাথু সবটাই ভিডিও রেকর্ড করে রেখেছিলেন। অভিযুক্তরা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না তিনি টাকা নেননি। এই সূত্রেই আসবে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূলের একটি সরকারি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রসঙ্গ। গত শনিবার ইডি কর্তারা জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন— ‘অপরিচিত অনেকের’ কথা। এই অপরিচিতদের এ যাবত অপ্রকাশিত অনেকের সঙ্গেই ইডি দেখা করা শুধু নয় প্রয়োজনে তাদের বাড়ি, অফিস, কার্যালয় যে কোনো জায়গায় অতর্কিতে তল্লাসি করতে পারবে। এই অপরিচিতদেরও যে মামলায় বড় ভূমিকা আছে সে কথা তদন্তকারীরা অস্বীকার করছেন না।

স্বাস্থ্য সচেতনতার নতুন প্রতীক দেশি গভির দুধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যা প্রচার হচ্ছে তা নয়। দেশি গোরু বাঁচানো নিয়ে হল্লাবোলের মধ্যে সে অর্থে গোরু বাঁচানোর অছিলায় কোনো রাজনীতি নেই। হ্যাঁ, দেশি গাভির দুধের উপযোগিতাই মূল বিবেচ্য। দেশি দুধ অর্থে A_2 মিল্ক যা দেশি গাভির থেকেই শুধু পাওয়া যায়— এমন বিশ্বাসই স্বাস্থ্য সচেতন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। তারা দেশি গোরুর দুধই জোগাড় করতে তৎপর। এ বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ডেয়ারি ‘আমুল’ এই বিশ্বাসকে শিলমোহর দিয়ে বড় আকারে দেশি গাভির দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বলে খবর। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী বাজারে প্রাপ্ত দুধের বেশিরভাগটাই A_1 অর্থাৎ বিদেশি গোরুর। এই সংক্রান্ত গবেষণার কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ না হলেও যতটুকু জানা গেছে তাতে A_1 গোরুর দুধ থেকে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। অপরপক্ষে A_2 দুধপায়ীদের ওপর গবেষণায় দেখা গেছে যাঁরা চিকিৎসার পরিভাষায় **lactose intolerant** অর্থে দুগ্ধজাত দ্রব্য হজমে অসুবিধে বোধ করেন তাঁরাও এই দেশি গাভির দুধ সহজেই পরিপাক করতে পারেন। বিদেশে এই দুধ ইতিমধ্যেই বিপুলভাবে সমাদৃত হচ্ছে।

প্রত্যেক ভারতীয়কে মাথা গোঁজার ঠাঁই দিতে বদ্ধপরিকর মোদী সরকার

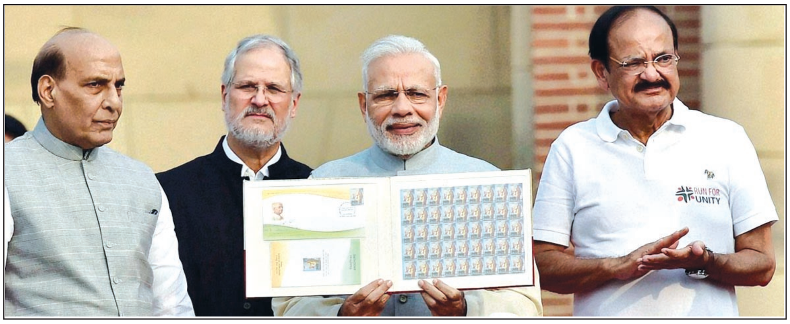

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উদ্বোধন করছেন শ্রীমোদী।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথায় ছাদ। সেই ছাদ হবে তাদের নিজস্ব। নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই স্বপ্ন ক্রমশ বাস্তবের পথে। গত ২৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় আবাস ও শহুরে দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক এক তথ্যে জানিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১ লক্ষ ৩৯৫টি বাড়ি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং অনুরূপ আরও ৬ লক্ষ বাড়ি তৈরি হওয়ার পথে। মন্ত্রক একইসঙ্গে ওইদিন ৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শহরাঞ্চলের গরিবদের জন্য আরও এক লক্ষ গৃহনির্মাণের ঘোষণা করেছে। এর ফলে নরেন্দ্র মোদীর এই স্বপ্নের প্রকল্পের ব্যয়-বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়াল ১ লক্ষ ৪৬৬ কোটি টাকা, যা দশ বছরের ইউপিএ জমানার চেয়ে তিন গুণেরও বেশি। প্রসঙ্গত, ২০১৫-র জুনে এই প্রকল্পটির সূচনা হয় এবং মন্ত্রক সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ২১৫১টি শহরে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য ১৮.৭৫ লক্ষ বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে।

২০১১-র জনগণনায় এক তথ্যে দেখা গিয়েছিল প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ মোটামুটি ১৬ কোটি ভারতীয়ের নিজস্ব বাড়ি নেই। এই জনসংখ্যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার খুব কাছাকাছি। মূলত এই পরিসংখ্যান থেকেই নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসে 'প্রত্যেক দেশবাসীর নিজস্ব গৃহ' প্রকল্প গ্রহণ করেন। সরকারের আরও বড় লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে আর্থিক অনগ্রসরদের জন্য ২ কোটি বাড়ি তৈরি করা। দেশের প্রায় চার হাজার শহরাঞ্চল জুড়ে গৃহীত হবে এই কর্মসূচি। এর প্রথম ধাপ হিসাবে ২০১৯ সালের মধ্যে অন্তত ১ কোটি গৃহ-নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে চাইছে সরকার। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাড়িগুলির 'কার্পেট এরিয়া' থাকবে ৩০ বর্গমিটারের কাছাকাছি। সেই সঙ্গে ন্যূনতম কিছু পরিকাঠামো যেমন জল, নিকাশি, রাস্তা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদির সুবিধা আবশ্যিকভাবেই থাকবে এবং সামাজিক কিছু পরিকাঠামো যেমন কমিউনিটি সেন্টার, উদ্যান, খেলার মাঠ, বিশ্রামাগার ইত্যাদির সুবিধাও দেওয়া হবে। কেন্দ্র দ্রুত এই প্রকল্পটি রূপায়িত করতে চাইলেও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে কিছু রাজ্যের অসহযোগিতায় প্রকল্পে তেমন গতি আসছে না বলে মনে করা হচ্ছে। এমনিতে এই প্রকল্পে কেন্দ্র নিজেকে যথেষ্ট নমনীয় অবস্থানে রেখেছে এবং রাজ্য সরকারগুলির মতামতকে প্রয়োজনীয় গুরুত্বও দেওয়া হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গৃহ-নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ১৮ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ওই রাজ্যে। ওই তালিকায় এর পরেই রয়েছে তামিলনাড়ু। ৯ হাজার ১১২ কোটি টাকা ব্যয়ে আড়াই লক্ষেরও বেশি বাড়ি তৈরির প্রস্তাব আছে তামিলনাড়ুতে।

অবশ্য প্রকল্প রূপায়ণের নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে গুজরাট। সেখানে এখনও পর্যন্ত ৫৯ হাজার ৫১৫টি বাড়ি তৈরি হয়েছে। এরপর তালিকায় রয়েছে তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ। ওই দুই রাজ্যে যথাক্রমে ৩৪ হাজার ৯৭৬ ও মধ্যপ্রদেশে ২৯ হাজার ৪৬৭টি বাড়ি তৈরি হয়েছে। এছাড়া বিহারে ১৬ হাজার ২, রাজস্থানে ১৩ হাজার ৪৪৯, ঝাড়খণ্ডে ১০ হাজার ২১২, কর্ণাটকে ৯ হাজার ৩৩৫, অন্ধ্রে ৫ হাজার ৬৭১ ও ওড়িশায় ৪১০৫টি গৃহ নির্মিত হয়েছে। আরও ২০ হাজার ৭টি বাড়ি এই রাজ্যগুলিতে নির্মাণের পথে বলে তথ্যে উল্লেখিত হয়েছে। প্রতি বাড়ি তৈরির খরচের ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বহন করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সিংহভাগ টাকা খরচ করার পরেও সামান্য বাদবাকিটুকু মেটাতে চরম অনীহা দেখাচ্ছে বেশ কিছু অ-বিজেপি রাজ্য সরকার। ফলে এই প্রকল্প বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে চরম সাফল্য পেলেও কয়েকটি রাজ্যে গতিহারা। ২০১০ সালে ম্যাকিনসে কোম্পানি এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে ভারত শহরাঞ্চলে বসবাসকারী অন্তত আড়াই কোটি পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁই জোটানোর ক্ষমতা নেই। ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটি ৩ কোটি ৮০ লক্ষে পৌঁছে যাবে বলে আশঙ্কা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই স্বপ্নের প্রকল্পটি রূপায়িত হলে এই আশঙ্কা আর থাকবে না বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

৯০ শতাংশ অসমীয়র জমি সংক্রান্ত মালিকানার দলিল নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মূল অসমীয় ভূমিপুত্রদের জমি সংক্রান্ত অধিকার সংরক্ষিত করতে অসম সরকার নিয়োজিত ভূতপূর্ব মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হরিশঙ্কর ব্রহ্মার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জন্মসূত্রে অসমীয় ৯০ শতাংশেরই জমির দলিল নেই। এছাড়া কমপক্ষে ৮ লক্ষ অসমীয়র কোনো জমিই নেই। তারা ভূমিহীন। এই প্রসঙ্গে শ্রী ব্রহ্মা গৌহাটীতে জানান, নগাঁও জেলার ৭০ শতাংশ জমি বর্তমানে অসময়ীয়দের হাতে। নগাঁওর অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার জানাচ্ছেন, ওই ৭০ শতাংশ জমি ইতিমধ্যেই অসমীয়দের মধ্যে বিলি করা হয়ে গিয়েছে। হতাশা ব্যক্ত করে জন্মসূত্রে অসমীয় ব্রহ্মা বলেছেন, সম্ভবত সমগ্র ভারতের মধ্যে এই একটিই মাত্র জেলা রয়েছে যেখানকার ৭০ শতাংশ জমি ভূমিপুত্রদের হাত ছাড়া। অসমে সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বে নতুন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত হওয়া এই কমিটি কীভাবে অসমের জমি আদি বাসিন্দাদের মধ্যে বণ্টন করা যায় আগামী জুন মাসে সেই সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিল করবে বলে প্রকাশ। এই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সরকার নতুন জমি নীতি তৈরি করার সব রকম পন্থা নিয়েছে। কেননা সরকার বিশ্বাস করে যে, নিজস্ব ভূমি ছাড়া অসমীয় জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং এক্ষেত্রে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্বই হচ্ছে আমাদের মূল বসবাসকারীর জমি নিরাপদে তাঁর নামে পঞ্জীকৃত করা। এ বিষয়ে সরকার কখনই কোনো আপোশ করবে না।

উবাচ

“দু’ বছর আগে একটা দল (আপ) ৬৭টি বিধানসভা আসনে জিতেছিল, তারা ৬৭টি ওয়ার্ডেও জিততে পারেনি।”

মনোজ তেওয়ারি
দিল্লি বিজেপি সভাপতি

দিল্লির পুরসভাগুলির নির্বাচনের ফলের প্রসঙ্গে।

“পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এমন যে লোকেরা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে বাধ্য। অসমের জনভারসাম্যের পরিবর্তনের কথা প্রত্যেকেই জানে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব এখন বাস্তবে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। বাংলার মানুষদের এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন থাকা দরকার।”

কেশরীনাথ ত্রিপাঠি
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

টাইমস অব ইন্ডিয়া-র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে।

“আমি আশা করি মুসলমান সমাজের ভেতর থেকেই প্রবুদ্ধজনেরা এগিয়ে আসবেন এবং আমাদের মুসলমান মেয়ে ও মায়েদের এই কুপ্রথার (তিন তালাক) অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

মনীষী বসবেশ্বর জয়ন্তী উৎসবের সমাবেশে।

“আমি অবাক হয়ে যাই যে, যে বন্দে মাতরম্ গেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একদিন ফাঁসিকাঠে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই বন্দে মাতরম্-কে এখন ঐচ্ছিক করে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র বিদ্যাভারতী স্কুলগুলিতে এখনও তা বাধ্যতামূলক রেখেছে।”

যোগী আদিত্যনাথ
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

গোরক্ষপুরে আর এস এসের এক কার্যক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

মিথ্যাচারের রাজনীতি করে সিপিএম মুছে গেছে, তৃণমূলও মুছে যাবে

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের তিনদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাবাজি শুনতে শুনতে একটা কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করছে যে বাংলা এবং বাঙালির প্রকৃত শত্রু কে? এর উত্তর যারা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই রাজ্যের সর্বনাশ করেছে। বিজেপি এখনও পর্যন্ত বাংলায় মসনদে বসেনি। তাই বিজেপি ভাল না মন্দ দল তার বিচার করার সময় আসেনি। তৃণমূল দলটি সবে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করেছে। তাই কিছুটা সময় দিতে হবে লাভ ক্ষতির পাল্লায় তোলার আগে। দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছে প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে বামজোট। কংগ্রেস আমলে অর্থাৎ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেনদের আমলে সুশাসন তেমন না থাকলেও কুশাসন ছিল না। তাঁদের অতি বড় সমালোচকও স্বীকার করবেন যে তাঁরা কালোটাকার কারবারি ছিলেন না। কিছু চরিত্রহীন ঘুষখোর বাঙালি বাম নেতা প্রচার করতো যে কলকাতার বিখ্যাত স্টিফেন হাউসের বেনামি মালিক অকৃতদার গান্ধীবাদী নিপাট ভালমানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে চলে আসা মানুষজনদের খেপিয়ে ভুল বুঝিয়ে বামপন্থার শিকড় বাঙালি মানসিকতায় চারিয়ে দেওয়াটাই ছিল বামদের রাজনৈতিক কৌশল। কংগ্রেস আমলের শেষ পাঁচ বছর (১৯৭২—৭৭) মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনি এবং তাঁর দুই সাঙ্গোপাঙ্গ সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাংলা ও বাঙালির যথেষ্ট সর্বনাশ করেছেন।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জরুরি অবস্থা চলাকালে রাজ্যে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করার অভিযোগ নিয়ে তদন্ত কমিশন বসান জ্যোতি বসু। তখন সকলে জ্যোতিবসুর জয়গানে মুখর ছিলেন। বছর ঘুরতেই দেখা গেল এটা জ্যোতিবাবুদের কৌশল। জানা গেল, তদন্ত কমিশনের ভয় দেখিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের কাছ থেকে দাসখত লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। নিট ফল, প্রদেশ কংগ্রেস দলটাই সাইনবোর্ড হয়ে গেল। শত

গূঢ় পুরুষের কলম

চেষ্টাতেও ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীরা বাংলার কংগ্রেসের দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেননি। রাজনীতি যে ঘোড়া বেচাকেনার বাজার পশ্চিমবঙ্গে সেটা প্রথম শুরু করে বামপন্থীরা। আজকের প্রমোটাররাজ, চিটফান্ড কারবার সবই চালু হয়েছিল জ্যোতি বসুর রাজত্বে, তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

রাজ্যে ঘুষখোর মন্ত্রী আমলাদের রমরমা শুরু হয় বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বে। এই দীর্ঘ সময়ে মহাকরণের সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতায় দেখেছি অসৎ ব্যবসায়ীদের রাজার খাতির ছিল মন্ত্রীদের ঘরে। ব্যাপারটা এতই সহজ ছিল যে এটা দুর্নীতি বললে মহাকরণে কেউ পাত্তা দিত না। ট্রান্সফার, প্রমোশন ইত্যাদিতে ঘুষের কারবার চালাতো সিপিএম-প্রভাবিত সরকারি কর্মচারী সংগঠন। ঘুষের বখরা নিয়ে অন্য বামদলের সংগঠনের নিয়মিত হাতাহাতির ঘটনা সেই সময়ের সাংবাদিকরা প্রতিদিন দেখতেন। মহাকরণের ক্যান্টিনের সামনে খোলা চাতালে শরিকি মারামারির ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে গিয়ে অসংখ্যবার কাগজের চিত্রসাংবাদিকরা মার খেয়েছেন। বাংলার রাজনীতিতে বামপন্থীরা আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্য দলের নেতা- কর্মীদের চরিত্র হনন করার নোংরামিটা আমদানি করেছিল। ভোটের দিনে সিপিএমের রিগিং স্কোয়ার্ড সন্ত্রাস করে বাম বিরোধীদের ভোটের লাইনেই দাঁড়াতে দিত না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, খুন, জমি জবরদখল করা বাম রাজনীতির অঙ্গ ছিল। তবু শেষরক্ষা হয়নি।

সিপিএমের দেখানো পথেই তৃণমূল দলটি এখন চলছে। ক্যামেরার সামনে তৃণমূল মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিচ্ছেন। দিদি নিজে জানেন দলের মন্ত্রী সাংসদরা ঘুষখোর। অথচ তাদের সাময়িকভাবে সরিয়ে দেওয়ার মতো নৈতিক সাহস তাঁর নেই। মুখে উন্নয়নের ফুলঝুরি ছড়িয়ে বাংলার মানুষজনকে ভুল বোঝাচ্ছেন। তলায় তলায় যে চিচিং ফাঁক হয়ে যাচ্ছে সে কথাটা ক'জন বুঝছেন। বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা একদা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নানারকম জালিয়াতি করে নিজেদের পকেটে পুরতেন। সেই একই জালিয়াতি আজও চলছে। শুধু বদলেছে রং। লাল এখন সবুজ হয়েছে। বামফ্রন্টের রেখে যাওয়া দেড় লক্ষ কোটি টাকা দেনা এখন দিদির রাজত্বে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা । বাজার থেকে তোলা এই বিপুল অঙ্কের টাকার দেনা শোধ করতে বললে দিদির গোঁসা হয়। প্রতিটি দলীয় জনসভায় দিদি মানুষকে বোকা বানাতে বলেন, 'আমরা কষ্ট করে রাজস্ব সংগ্রহ করছি আর দিল্লির বিজেপি সরকার দেনা শোধ করার নামে সেই টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে।' ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করলে তা সুদ-সহ কিস্তিতে ফেরত দিতে হয়। এই সরল সত্যটি সকলেরই জানা। তবু দিদির বিশ্বাস কৌশলে মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিলে বাংলার মানুষ ধরতে পারবে না। সিপিএম এই মিথ্যাচারের রাজনীতি করতো। তাই তারা আজ বাংলার মাটি থেকে মুছে গেছে। তৃণমূলও মুছে যাবে। শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। ■

সগর্বে বলো 'দিদি' হিন্দু

প্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস ভাই ও বোনেরা,

প্রতিদিন সকালে উঠে জপ করুন— 'আমি হিন্দু', 'আমি হিন্দু'। চিৎকার করে দিনে তিনবার বলুন— 'দিদি হিন্দু'।

আর উপায় নেই। এটা আমার মতো আপনাদেরও বলতেই হবে। দিদির ভাই হিসেবে আমি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি। বিশ্বাস করুন বন্দ্যোপাধ্যায় পদবি হলেও আমি ভুলেই গিয়েছিলাম 'দিদি হিন্দু'।

ভুল হবেই বা না কেন বলুন! এমনি এমনি তো আর কিছু হয় না। কিন্তু দিদি চকচকে প্রমাণ দিয়ে দিয়েছেন তাঁর ধর্ম নিয়ে। এতদিন যে-কোনো ফর্ম ফিলআপ করার সময়ে রিলিজিয়ন কলমে হিন্দু লিখলেও এবং ঘটা করে কালী পুজো করলেও দিদিকে হিন্দু ভাবতে কোথায় যেন সমস্যা হোত। মনে হোত উনি একজন উদার মুসলমান যিনি বাড়িতে কালী পুজোও করেন।

কিন্তু কী ভাবে দিদি হিন্দু হয়ে গেলেন! মনে বিস্ময় জাগছে তো! বলে দিচ্ছি। পুরীর মন্দিরের নিয়ম অনুসারে সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারেন না। এই কথা মন্দিরের সিংহদ্বারেই লেখা রয়েছে। পুরো বীজগণিতের ফরমূলা। সুতরাং, তিনি যখন পুজো দিতে পেরেছেন তখন তিনি হিন্দু। শুধু পুজো দেওয়াই নয় এই রাজনৈতিক পুজোর শেষে দিদির মুখে কখনো না শোনা কথাও শুনে আমি প্রায় ভিরমি খেয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, 'আমিও হিন্দু। আমি হিন্দুদের ভালাবাসি।'

ভাগ্যিস বললেন। না হলে গোটা দেশের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যে 'অ-হিন্দু' ইমেজ তৈরি হয়েছে, তাঁর হিজাব পরা ছবি দেখেই এই ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। তাইতো এখন দিদিকে জোর গলায় 'আমি হিন্দু' বলতে হলো। তিনি গো-মাংস ভক্ষণের পক্ষে। তিনি নারী হয়েও তিন তালাকের পক্ষে। এসব দেখে পুরী মন্দিরের দ্বৈতাপতিরা কী করে বুঝবেন বলুন তো তিনি হিন্দু। আমি দিদির ভাই হয়েই বুঝতে পারিনি! এখন বুঝেছি। কীসের চাপে, কেন দিদি এখন এসব বলছেন, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। এতদিন বিরোধিতা করলে 'মাওবাদী' বলতেন দিদি। এখন 'আর এস এস' বলে দেবেন। তখন ঠেলা বুঝবেন।

আপনারা কী ভাবতেন আপনারা জানেন, কিন্তু আমি দিদিকে অহিন্দু ভাবতাম কেন সেটা বলতে পারি। কারণ, দিদি অনেক বাধা অতিক্রম করে এই রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছু করতে চেয়েছেন। কেমন বাধা এসেছে নমুনা বলতে হবে? ঠিক আছে বলছি।

বিজয়া দশমীতে বিসর্জন বন্ধ করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ছিল, বিশেষ কোনো সম্প্রদায়কে খুশি করতে এই কাজ করছে রাজ্য সরকার। আদালত বলেছে, ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে পর পর দু'বার বিজয়া দশমীর পরদিনই ছিল মহরম। তখন তো কোনো সমস্যা হয়নি। এইটুকু আইন-শৃঙ্খলা যারা সামলাতে পারে না তাঁদের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

তার পরেও সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘুদের তোষণের কোনো সুযোগ ছাড়েননি তিনি।

এবার দেখে নিন মমতা মুসলমানদের কী দিয়েছেন, আর কী পেয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মোট মুসলমান ভোটের ৫১ শতাংশই গিয়েছে তৃণমূলের ঝুলিতে। যদিও ২০১১-র 'পরিবর্তনের ভোট'-এ সংখ্যাটা ছিল অনেক কম, মাত্র ৩৫ শতাংশ। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ২১১ জন বিধায়কের মধ্যে ৩২ জন মুসলমান সম্প্রদায়ের। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়নের বাজেট চার গুণ বাড়িয়ে ২,৪০০ কোটি টাকা করা হয়। অনেক অনেক কবরস্থান বাড়িয়েছেন, সাজিয়েছেন। একেবারে অখিলেশ যাদবের কায়দায়। উত্তরপ্রদেশের ভোট দিদিকে শিখিয়েছে সেই কবরস্থান দলের 'কবর' খুঁড়তে পারে। ইতিমধ্যে নিজের বিধায়ক ও সাংসদদের নিজের নিজের তহবিল থেকে শ্মশান সংস্কারে খরচ করারও নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী।

দিদিকে হিন্দু হতে সাহায্য করুন। বিজেপিকে রুখতেই হবে। আগামী বছর রামনবমীর মিছিল আপনারা করুন তৃণমূলের ভাই বোনেরা। দিদি তো এখন রামনবমী হনুমান পুজো সবেতেই ফেসবুকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছেন। এর পরে ইতু পুজোও বাদ যাবে না। কিন্তু দিদি এখন বুঝছেন অঙ্কে কোথায় একটা ভুল হচ্ছে। দুই আর দুই-এ চার না হয়ে বাইশ হয়ে যাচ্ছে। তাই তো দিদি শ্রীক্ষেত্র পুরীতে গিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে 'মুসলমান' থেকে 'হিন্দু' হলেন।

হে তৃণমূলগণ, আপনাদের এখন একটাই কাজ। রাজ্য জুড়ে প্রচার করুন— 'দিদি হিন্দু', 'দিদি হিন্দু', 'দিদি হিন্দু'।

—**সুন্দর মৌলিক**

বিজেপি বিরোধীরাও মমতাকে বিপজ্জনক ভাবছে

সাধন কুমার পাল

গত ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরী থেকে ভুবনেশ্বরে গিয়ে 'নবীন নিবাসে' মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সবার নজর ছিল বৈঠক শেষের সাংবাদিক সম্মেলনের দিকে। ক'দিন আগে ভুবনেশ্বরে বিজেপির জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক থেকে কর্মীদের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেছিলেন, এবার দৌড়লে চলবে না ঝাঁপ দিতে হবে, লং জাম্প চাই। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই বিকল্প শক্তি হয়ে উঠার কথা বলেছিলেন। কর্মীদের বাংলা জয় করে বিজেপির স্বর্ণযুগ আনয়নের স্বপ্নও দেখিয়েছেন। অতি সম্প্রতি ওড়িশার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেডিকে বড়সড় ধাক্কা দিয়ে বিকল্প শক্তি হয়ে উঠার পর এবার অমিত শাহের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট। এই রকম একটি প্রেক্ষাপটে নিজেদের রাজনৈতিক গড় অটুট রাখার লক্ষ্যে মমতা-নবীন এক জোট হয়ে তীব্র বিজেপি বিরোধী বার্তা দেবেন এটাই প্রত্যাশিত ছিল। বৈঠক শেষে প্রত্যাশা মতো সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা ব্যানার্জি বিজেপিকে ঠেকাতে আঞ্চলিক জোটের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎ নিয়ে নবীনের বার্তা ছিল নিরামিষ, 'এটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার'। উঠছে প্রশ্ন, মমতার জোট প্রস্তাবে নীতীশের পথেই কি নবীন? এমন মতও উঠে আসছে যে দুই রাজ্যের দিকেই ধেয়ে আসা গেরুয়া ঝড় ঠেকাতে দুই মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে কোনো কথা হয়নি এটা হতে পারে না। কৌশলগত কারণেই হয়তো আপাতত এই সম্ভাবনা সামনে আনা হচ্ছে না।

কিন্তু বিজেডির প্রবীণ নেতাদের সূত্র বলছে, এই মুহূর্তে দল মমতার সঙ্গে জোট করতে আগ্রহী নয়। এ ব্যাপারে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তারা আরো দু'বছর অপেক্ষা করতে চায়। কারণ তাদের মতে তৃণমূল সরকারের 'প্রো-মাইনোরিটি' নীতির জন্য মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর দলকে ঘিরে 'অ্যান্টি হিন্দু' এবং বিমুদ্রীকরণের তীব্র বিরোধিতা; সেই সঙ্গে আমজনতার প্রতারণার অর্থে সমৃদ্ধ চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে পুরো দল জড়িয়ে যাওয়ার জন্য 'অ্যান্টি পুওর' ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। ফলে এই মুহূর্তে নবীন-মমতা জোট হলে ওড়িশায় বিজেডির জন্য ভালোর চেয়ে অনেক মন্দটাই বেশি হবে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ওড়িশার মুসলমান জনসংখ্যা ২.১৭ শতাংশ। বিজেডি নেতাদের মতে, এই পরিস্থিতিতে একক শক্তিতে লড়লে বেশি সুবিধে পাওয়া যাবে। কারণ মমতার সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে লড়াই করলে 'অ্যান্টি পুওর', 'অ্যান্টি পুওর', 'অ্যান্টি হিন্দু' এই সমস্ত ইস্যু বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে। নির্বাচনী ময়দানে এই সমস্ত তকমা ওড়িশায় নরেন্দ্র মোদীকে আরো অনেক বড় হিরো করে তুলবে। ওড়িশার এই নেতাদের আরো ধারণা বাংলার রাজনীতিতেও এই ধরনের মেরুকরণের ফলে মমতা নিজেও ক্রমশ রাজনৈতিক জমি হারাবেন এবং সর্বভারতীয় জোট তৈরি হলেও মমতাকে নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে।

মমতা ব্যানার্জির প্রো-মুসলিম ভাবমূর্তি ওড়িশার জনমানসেও যে প্রভাব ফেলেছে পুরী জগন্নাথদেবের মন্দিরে পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেও তা স্পষ্ট। গো-মাংস নিয়ে অবস্থানের জন্য কিছু সেবাইত নেত্রীর মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপত্তি জানান। স্টেট গেস্টের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিজেডি সরকার ওই সেবাইতকে আটক করে। বিষয়টিকে প্রশাসনিক ভাবে সামলে নিলেও স্পর্শকাতর এই বিষয়টি যে ওড়িশার জনমানসে মমতার ভাবমূর্তি নিয়ে একটি নেতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে বিজেডি নেতাদের আচরণেই তা স্পষ্ট। মমতার সঙ্গে জোট বাঁধলে এই বার্তা প্রায় ৯৮ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যার রাজ্যে যে ভোটের বাজারে বিরূপ প্রভাব ফেলবে নবীন পট্টনায়কের মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিকের তা না বোঝার কথা নয়। তাছাড়া মন্দির থেকে বেরিয়ে নিজেকে সাচ্চা হিন্দু বলে ঘোষণা করে মমতা ব্যানার্জি নিজেই প্রমাণ করলেন নিজের প্রো-মুসলিম ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি নিজেও সচেতন।

বিমুদ্রীকরণের সময় পথে নেমে বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিকে জোটবদ্ধ করতে গিয়েও মমতা ব্যানার্জি ধাক্কা খান। অরবিন্দ কেজরিওয়াল ছাড়া আর কোনো নেতা-নেত্রী প্রকাশ্যে মমতার পাশে দাঁড়াননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়ানো মানুষকে নোট বাতিল নিয়ে নানা প্ররোচনা দিয়েও যে উত্তেজিত করা যায়নি এ দৃশ্যও বিভিন্ন মিডিয়ার দৌলতে মানুষ দেখেছে। নোট বাতিলের জেরে কৃষকরা চাষ করতে পারছেন না ফলে দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে এমন কথাও বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে মানুষ দেখছে আলুর অধিক

ফলনের জেরে চাষিদের দিশেহারা অবস্থা। এখন মানুষ বলছে মমতার আন্দোলন ছিল কালোটাকার পাহাড়ে বসে থাকা মানুষের স্বার্থে। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা ও মিডিয়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও এটা দেখা গেছে যে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে দেশের আমজনতা টাকার পাহাড় জমিয়ে রাখা ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে একটি বড়সড় আঘাত হিসেবে দেখেছে। বিমুদ্রীকরণের পর থেকে বিজেপি ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে একের পর এক জয়ী হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে রেকর্ড ভাঙা জয় প্রমাণ করেছে যে আমজনতা দু' হাত তুলে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। এ ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জি প্রথম প্রকাশ্য সরাসরি ধাক্কাটি খেয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কাছ থেকে। সময়ের সঙ্গে এখন এটা প্রমাণিত যে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে 'গরিব বিরোধী' তকমা লেগে যেতে পারে নীতীশের মতো দুরদর্শী রাজনীতিক তা বুঝতে ভুল করেননি।

২০১৪ লোকসভা ও তার তিন বছর পর উত্তরপ্রদেশে বিপুল জয় যে বিরোধী শূন্য ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়া যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। অনেক মানুষই এতদিন ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিজেপির মতো হিন্দুত্ববাদী দলকে মুসলমান বিরোধী তকমা লাগিয়ে রাজনৈতিক ভাবে অচ্ছুত করে রাখাটাকেই মূলস্রোতের রাজনীতি বলে গণ্য করতেন। এখন বদলে গিয়েছে ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ। ধর্মনিরপেক্ষতার ওভার ডোজের নামে মুসলমান তোষণের দাওয়াই দিয়ে যে বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়াকে রোখা যাবে না এ বিষয়েও বোধ হয় খুব একটা সংশয়ের অবকাশ নেই। দেশ জুড়ে গেরুয়া ঝড়ের দাপট দেখে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারতে এখন রাজনীতির মূলস্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু করছে না তো? অর্থাৎ 'প্রো-মুসলিম' বা 'হিন্দু বিরোধী' তকমা প্রাপ্ত স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি রাজনীতির মূলস্রোত থেকে পৃথক হয়ে পড়ছে না তো?

এই প্রশ্ন বিজেপি বিরোধী দলগুলিকেও খুবই ভাবাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যেও 'নরম হিন্দুত্ববাদী' মুখের অভাব নেই। কিন্তু ওই রাজ্যে যোগী আদিত্যনাথের মতো গেরুয়াধারী 'বলিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদী নেতা' বলে পরিচিত একজনের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়া ভারতীয় রাজনীতির প্রচলিত ধারা পরিবর্তনের প্রশ্নকে কি আরো জোরালো করে তুলেছে না? এই কারণেই হয়তো বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার ডাক দিয়ে মমতা ব্যানার্জি সাড়া পাচ্ছেন না। অখিলেশ-মায়াবতীর মতো ভরাডুবির ভয়েই হয়তো নীতীশ-নবীনের মতো অন্য ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী দলগুলিও 'প্রো-মুসলিম', 'অ্যান্টি পুওর' ইমেজ সম্পন্ন মমতা ব্যানার্জির হাত ধরতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে মমতা এখন একা। যত দিন যাবে এই একাকিত্ব ততই বাড়বে। এই একাকিত্ব-জাত আতঙ্ক যে মমতা ব্যানার্জিকেও ক্রমশই গ্রাস করছে তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় ক্ষমতা হারানোর ভয়ে চিরশত্রু বামেদেরও সংগঠন ধরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন, বামপন্থীদের বিজেপিমুখী হতে বারণ করছেন। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে উত্তরপ্রদেশের চিরশত্রু অখিলেশ মায়াবতী হাত মেলাতে যাচ্ছেন। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিজেপিকে ঠেকাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মমতা সিপিএম ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়তে উদ্যোগী হবেন এটাই স্বাভাবিক। বলা যায় ভারতীয় রাজনীতি এখন এক চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বিশঁ বাও জলে বিজেপি বিরোধী জোট। ফলে মাঠ এখন ফাঁকা। এই ফাঁকা মাঠে বিরোধী শূন্য ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিজেপি আরো কতটা এগোয় সেটাই এখন দেখার।

অখিলেশ-মায়াবতীর মতো ভরাডুবির ভয়েই হয়তো নীতীশ-নবীনের মতো অন্য ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী দলগুলিও 'প্রো-মুসলিম', 'অ্যান্টি পুওর' ইমেজসম্পন্ন মমতা ব্যানার্জির হাত ধরতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে মমতা এখন একা। যত দিন যাবে এই একাকিত্ব ততই বাড়বে।

গণতন্ত্রের পোশাকে একনায়কতন্ত্র

অমলেশ মিশ্র

হ্যাঁ, একে বলা যায় বিরোধালংকার বা ইংরেজির অক্সিমোরন। সর্ব দুঃখহর গণতন্ত্র, তার মধ্যে আবার একনায়কতন্ত্র আসে কোথা থেকে? একনায়কতন্ত্রের যাবতীয় অত্যাচার অনাচার, দুর্নীতি ইত্যাদি অবসানের জন্যই বা অবসানের পরেই তো জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের সরকার— গণতান্ত্রিক সরকার। এর মধ্যে একনায়কতন্ত্র আসে কোথা থেকে? হ্যাঁ, আসে। এবং এসেই পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। (১) আমাদের গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক। পাঁচবছর অন্তর নির্বাচন হয়। আমরা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করি। যে দলের প্র তিনিধি সংখ্যা বেশি হয়, সেই দল সরকার গঠন করে শাসন করে। যদিও সংবিধানে এমন উল্লেখ পাই। গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের খাতিরে আমরা তা করে নিয়েছি। দল একটি সঙ্গে থাকলে একনায়কতন্ত্রী হওয়ার সুবিধা হয়। একথা খুব পরিষ্কার করে জানতে হবে যে কোনো দলই অঙ্কের হিসাবে মোট জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন দাবি করতে পারে না।

ধরা যাক, কোনো দেশের মোট লোক সংখ্যা ১৪০। এর মধ্যে ৪০ জনের ভোটাধিকার নেই। তাহলে ভোটার সংখ্যা দাঁড়ালো ১০০। নির্বাচনে ১০০ জনই ভোট দেন না। ৫০-৫৫ জন বা ৮৫ জন ভোট দেন। ধরা যাক গড়ে ৮০ জন ভোট দেন। এই ৮০ জনের ভোট প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়— ৩৫-৩০—১০-৫ এই ভাবে। সব থেকে বেশি ভোট যিনি পাবেন, ধরে নেওয়া হয়েছে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছেন। প্রকৃত হিসাবে দেখা যাবে যে তিনি মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ, আর মোট ভোটদাতার ২৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। ফলত মোট জনসংখ্যা বা মোট ভোটার কোনো দিক দিয়েই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ নন। যে ৮০টি ভোট দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৪৫ জনই অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তাকে সমর্থন করেনি। তাহলে যে গণতন্ত্রের কথা এত বড় গলা করে বলা হয় তা আসলে ধাপ্পা। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন— যা গণতন্ত্রের তথা সাধারণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় তা অনুপস্থিত। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, 'সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি' বলে গণতন্ত্রে যে বিষয়টির উপর আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তার ভিত্তি খুবই দুর্বল।

(২) ভোট হয়ে যাওয়ার পর যাই-ই ঘটুক না কেন, ভোটাররা ৫ বছরের আগে তাদের প্রতিনিধি পরিবর্তন করতে পারেন না। এই ৫ বছরে, যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, তারা একনায়কতন্ত্রী হয়ে যায়।

(৩) আইনসভা, আলোচনা চক্র, সংবাদমাধ্যম, কোনো কোনো বিষয় নিয়ে হৈচৈ করে বটে, সরকার সেগুলির কোনো গুরুত্ব দেয় না— একতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে।

রাজনৈতিক দলগুলি কিছু কিছু আন্দোলন করে বটে তবে তা Fight to Finish মানের নয়। লক্ষ্য থাকে, সরকারের কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে নিজ নিজ দলের অস্তিত্ব জাহির করা। দলগুলি ধারণা করে নেয়— (ক) জনগণ দলের প্রতিক্রিয়া জানাল এবং সমর্থন বজায় রাখল।

(খ) এই সব উষ্মা পুঞ্জীভূত হয়ে পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিক্রিয়া জানাবে, যা চলতি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবে।

এই দুটি ধারণার মধ্যে প্রথমটি আংশিক সত্য আর দ্বিতীয়টি ভুল। কারণ মানুষ অতীতকে বেশিদিন মনে রাখে না আর নির্বাচনে ভোট কেনা-বেচার ব্যাপার থাকে। Fight to Finish হলে, বিরোধীরা ব্যর্থ হলেও, জনগণের মনে তা বেশিদিন থাকত।

(৪) নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে দলপতি নানাধরনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিলক্ষণ জানেন যে তিনি তা পূরণ করতে পারবেন না। তাই ক্ষমতায় পৌঁছনোর দিন থেকেই ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। যে কোনো সমালোচনা ও বিরোধিতাকে চূর্ণ করতে সরকারি শক্তির সার্বিক প্রয়োগ করেন। তখন একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরে।

ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয়ের তাড়নায় গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র তখন দুটি কাজ করে—

(ক) সমালোচনামূলক মত প্রকাশের রাস্তা বন্ধ করা, অর্থ অথবা সন্ত্রাসের সাহায্যে নিজের অনুকূলে হাওয়া তৈরি করা।

(খ) সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে এক পক্ষের সমর্থন সুনিশ্চিত করা। সমাজে হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্গ, নিম্নবর্গ, চাষি, শ্রমিক, মালিক, পথচারী-হকার, অমুক এলাকা-তমুক এলাকা ইত্যাদি। এছাড়াও পিছড়েবর্গ, জাতি, উপজাতি প্রভৃতি আছে। এদের মধ্যে ঐক্য সাধিত হলে বিভেদ সৃষ্টি করা গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের কৌশল। একপক্ষের চাহিদা সাফল্য মিটিয়ে অপরপক্ষকে উত্তেজিত রাখা যাতে বিরোধ দাঙ্গার আকার নিতে পারে। আবার দাঙ্গাকে প্রকাশ্যে নিন্দা করাও এই সরকারের কাজ।

ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে আসে অনিশ্চয়তা, অনিশ্চয়তা থেকে অরক্ষিত থাকার ভাবনা। তার থেকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, তার থেকে সর্বত্র ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া। ঠিক এইখানেই চাটুকার ও তাঁবেদার দল তার চারিদিকে ভিড় করে। এদের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি। গণতান্ত্রিক-একনায়কতন্ত্র স্থাপনে এদের ভূমিকা মূল্যবান। এরা সরকারের তাঁবেদারি করে নিজের জন্য, সরকার এদের পালন পোষণ করে নিজের জন্য।

দলপতি আর কোনো সমস্যার গভীরে যেতে পারেন না। সমস্যাগুলি তার নিজেরই তৈরি। হতাশা তাকে গ্রাস করে। এই অবস্থায় ক্ষমতা ত্যাগই যুক্তিযুক্ত পথ। কিন্তু ততদিনে তার ক্ষমতায় নেশা হয়ে গেছে।

চাটুকার-তাবেদাররা চায় না, তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করুন। তারা চতুর্দিকে একটা 'সব ঠিক হ্যায়' বলয় তৈরি করে। দলপতি তার ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে সেই বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তার একমাত্র নীতি হয়— ভেদ এবং দণ্ড। তিনি কোনো সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। সমালোচনা ও আন্দোলনের জন্য দণ্ড এবং জনসমাজের জন্য ভেদ— উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, মারমুখী সংখ্যালঘু, গুণ্ডা, সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

(৫) এইভাবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৪০ জনের উপর প্রভুত্ব করার জন্য মাত্র ৬৫ জনের সমর্থন প্রয়োজন। প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করে, মানুষের মতামতকে ক্রয় করা হয়।

(৬) রাজনীতির উত্তাল সময়ে, বিশেষ করে নির্বাচনের সময়ে, একজন ওজস্বী দলনেতার, সত্যকথন ও যুক্তি বুদ্ধির প্রয়োজন থাকে না। পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতার দরকার হয় না। একমাত্র দরকার--- ওজস্বী ভাষায় জনগণকে বোঝানো যে তিনিই ত্রাণকর্তা। জনগণ যা চাইবে তাই-ই পাবে— আকাশের চাঁদও। অনুগামীরা এই সরকারি ক্ষমতা প্রাপ্তিকে নিজেদের ক্ষমতাপ্রাপ্তি হিসেবে দেখে। তাদের একমাত্র কাজ হয় অর্থসংগ্রহ। আইন এখন চাটুকার তাঁবেদারদের হাতে। ফলে অর্থসংগ্রহ কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না। এইভাবে গণতন্ত্র ও সরকারের দুর্বৃত্তায়ন হয়ে থাকে। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা নির্বাচিত হন তাঁদের অনেকেই নানা ধরনের অপরাধ ও অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। শিক্ষা, রুচি, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা বলতে বোঝায় ক্ষমতার দম্ভ। আইনসভায় যুক্তিতর্ক করার মতো পুঁজি না থাকায়, কেবল হৈচৈ, মারামারি, সভা স্থগিত, ওয়াক আউট ইত্যাদি সংবিধান বহির্ভূত অগণতান্ত্রিক ঘটনাগুলি ঘটেই চলে। ক্ষমতাসীনরা লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে গর্বিত হন। দলপতিরাও এমন প্রতিনিধিদের পছন্দ করেন। তাই আইনসভায় কোনো উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা শোনা যায় না। সংবাদমাধ্যমগুলির আলোচনা চক্রগুলিও বিরক্তিকর হয়। দলপতি একেই গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দেন সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায়। কারণ এরা এখন চাটুকার ও তাঁবেদার গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেছেন।

(৭) অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অর্থাৎ ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন এক সঙ্গেই চলে। যার যত প্রতিপত্তি সে তত অর্থায়ন করে। জনপ্রতিনিধিদের আয় ৫ বছরে ৭০০ গুণ এমনকী ৪৪ হাজার গুণ বেড়ে যায়। এই দৃশ্যমান অর্থ ছাড়াও অদৃশ্যমান অর্থ প্রচুর থাকে। তাকে কালোটাকা বলা যায়।

নেতার নিজের ও দলের অর্থের প্রয়োজন। ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ার ফলে সরকারের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকল্পের একটি বড় অংশ ক্ষমতাবানদের হাতে চলে যায়। ফলে এক দালাল শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই দালালশ্রেণী কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দলনেতার, দলের ও নিজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। যত বেশি প্রকল্প হয়, তত অর্থায়ন হয়। সব ব্যাপারেই নগদ টাকায় লেনদেন হয়ে থাকে। কালোটাকার কারণে সমান্তরাল অর্থনীতি চলে। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। জনগণ বঞ্চিত হয় এবং তাদের দেওয়া অর্থের (রাজস্ব ও অন্যান্য) একটি বড় অংশ পরিকল্পিতভাবে সরকারি কোষাগার থেকে দল, দলীয় নেতৃত্ব ও তাঁবেদার দালালদের কোষাগারে চলে যায়।

এই দুর্বৃত্তায়ন শুধুমাত্র সরকারি প্রকল্পেই হয় এমন নয়, তা সমাজের যে-কোনো অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। ব্যবসা আরম্ভ করতে, ব্যবসা চালাতে এমনকী ব্যবসা বন্ধ করতে হলেও অর্থ দিতে হবে। এই দুর্বৃত্তরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাম-ডাকওয়ালা সংগঠন তৈরি করে। ব্যবসায়ীরা তাদের দুর্বৃত্ত-বাবদ ব্যয়কে পুঁজি নিবেশের মধ্যে ধরে নেয়। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটে।

(৮) ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষককুল সবার সংগঠনই শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তাদের অবাঞ্ছিত ও অত্যাচারমূলক কাজগুলি নিন্দিত হওয়ার পরিবর্তে প্রশংসিত হয়। আইনের শাসন অবলুপ্ত হয়।

(৯) রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের থেকে গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র অনেক বেশি লুঠেরা। কারণ ওই দুই ক্ষেত্রে চুরি করার লোকসংখ্যা কম। গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রে লুঠেরার সংখ্যা অনেক বেশি এবং লুঠেরার রাজশক্তির প্রশ্রয়প্রাপ্ত ও বিচিত্রপথগামী।

(১০) গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রে প্রাণ সঞ্চার ও অত্যাচারের জন্য কোনো গেস্টাপো বাহিনী, রেড আর্মি, মিলিশিয়া ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। পাড়ায় পাড়ায় এই বাহিনী থাকে সাধারণ পোশাকে। তাদের অর্থায়ন ও দুর্বৃত্তায়ন নিশ্চিন্তে চালানোর জন্য গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থা সুবিধাজনক। তাই নির্বাচনে এই বাহিনী এমন ব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপিত করার জন্য যে-কোনো ভাবে ২৫-৩০ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করে দেয়। নির্বাচন তাদের কাছে জীবন-মরণ সংগ্রাম। হিটলার, মুসোলিনী, পলপট, মাও, লেনিন বা স্টালিন বেশিদিন টিকতে পারেননি। কিন্তু গণতান্ত্রিক-একনায়কতন্ত্রী দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

ত্রিপুরায় বামবিরোধী শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বিজেপি

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা। রাজ্যটির তিন দিকে বাংলাদেশ। ১০১৮ কিলোমিটার বিস্তৃত সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যে ৮৫৬ কিলোমিটারই বাংলাদেশ সীমান্ত। এই রাজ্যের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্বদিকে মাত্র ৫৩ কিলোমিটার অসম সীমান্ত এবং ১০৯ কিলোমিটার মিজোরাম সীমান্ত। রাজ্যটির আয়তন প্রায় ১০ হাজার ৪৯১ বর্গকিলোমিটার। এই আয়তনের আবার প্রায় ৬০ শতাংশই বনভূমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাঙালি, বাকি ৩০ শতাংশ তফশিলি উপজাতিভুক্ত দেশীয় সম্প্রদায়।

জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ধর্মালম্বীর সংখ্যা ৮১ শতাংশের অধিক এবং মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মালম্বী মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ১০, ৪ ও ৩ শতাংশ। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। ত্রিপুরা রাজ্য ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতে যোগদান করে এবং ১৯৫৬ সাল অবধি রাজ্যটিতে কোনো আইনসভা ছিল না। ১৯৬৩ সালে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন কংগ্রেসের শচীন্দ্রলাল সিংহ এবং ১৯৭১ সালের ১ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি শাসন জারির আগে পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যভার চালিয়ে যান। ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর The North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আর ওই আইন মোতাবেক ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে ত্রিপুরা পুর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে মর্যাদা পায়।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভার আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০ এবং তার মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর ৩৬টি, তফশিলি শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসন ৫টি এবং তফশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৯টি। ওই ১৯৭২ সালের নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘ মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দেয় এবং সবকটি আসনেই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সিপিআই ১১টি আসনে প্রার্থী প্রদান করলেও মাত্র ১টি আসনে জয়লাভ করে এবং ৮টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সিপিএম ৫৭টি আসনে প্রার্থী প্রদান করে মাত্র ১৬টি আসনে জয়লাভ করে। কংগ্রেস ৫৯টি আসনে প্রার্থী প্রদান করে ৪১টি আসনে জয়লাভ করে এবং ভোট পায় ৪৫ শতাংশেরও বেশি। ১৯৭২ সালের ২০ মার্চ কংগ্রেস ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে এবং সুখময় সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন। ১৯৭৭ সালে মাত্র ১১৬ দিনের জন্য কংগ্রেস ফর ডেমক্রেসি দল ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন প্রফুল্ল কুমার দাশ।

১৯৭৭ সালে ১০২ দিনের জন্য জনতা পার্টির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে এবং রাধিকারঞ্জন গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৭৮ সালের ৫ জানুয়ারি নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দল সরকার গঠন করে। ১৯৮৮ সালে বামফ্রন্টকে হঠিয়ে কংগ্রেস আবার সরকার গঠন করে। অবশ্য সেজন্য রাজীব গান্ধীকে অনেক কসরত করতে হয়েছিল। কিন্তু রাজীব গান্ধীর প্রয়াণের পর প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসার জন্য সিপিএমের সমর্থন নিতেও কংগ্রেস পিছপা হয়নি। আর তারই প্রতিদানে বলা যায় ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৯৩ সালের ১০ এপ্রিল দশরথ দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় আবার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দল সরকার গঠন করে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) মানিক সরকার ১৯৯৮ সালের ১১ মার্চ প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন এবং এখান অবধি তিনিই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

২০১২ সালের জানুয়ারির আগে অবধি

ত্রিপুরায় চারটি জেলা ছিল যথাক্রমে ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও পশ্চিম ত্রিপুরা। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে চারটি আরো নতুন জেলা ঘোষণা হয়। এইগুলি হচ্ছে খোয়াই, উনকোটি, সিপাহিজালা ও গোমতী। অর্থাৎ মোট ৮টি জেলা নিয়ে বর্তমান ত্রিপুরা গঠিত। বিগত ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩০টি আসন সাধারণ, ১০টি আসন তপশিলি জাতি এবং ২০টি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। ওই রাজ্যে তখন মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৯৩ এবং প্রায় ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ২০১৩ সালে সিপিআই মাত্র ১টি আসনে জয়লাভ করে, সিপিএম ৪৯টি আসনে জয়লাভ করে এবং কংগ্রেস মাত্র ১০টি আসনে জয়লাভ করে। বিজেপি ৫০টি আসনে প্রার্থী প্রদান করলেও ৪৯টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মোট ভোটের মাত্র ১.৮৭ শতাংশ ভোট বিজেপি পায়। আর সিপিএম পায় ৫৩.৮০ শতাংশ ভোট।

ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে দুটি লোকসভা আসন। একটি— পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র। আসনটি তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে গণমুক্তি আন্দোলনের নেতা দশরথ দেব আসনটিতে প্রতিনিধিত্ব করেন। ওই লোকসভা আসনের অন্তর্গত ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সিপিআইএমের জিতেন্দ্র চৌধুরী কংগ্রেস প্রার্থী থেকে প্রায় ৪ লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হন। অবশ্য বিজেপি চতুর্থ স্থান দখল করলেও ভোট বেড়েছে প্রায় ৫ শতাংশ। ত্রিপুরার অন্য লোকসভা কেন্দ্রটি হচ্ছে— পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র। ওই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রয়েছে ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং ৪টি জেলা রয়েছে যথাক্রমে— পশ্চিম জেলা, সিপাহীজলা, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অংশবিশেষ। ১৯৫২ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত একটি উপনির্বাচন সহ ১৬ বার পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য ভোট হয়েছে এবং ১১ বারই জয়ী হয়েছেন কমিউনিস্টরা। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত প্রায় ৪ লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়ী হন। বিজেপি মাত্র ৫৪ হাজার ৭০৬টি ভোট পেয়ে ওই আসনেও চতুর্থ স্থান লাভ করে।

সবেমাত্র যাত্রা আরম্ভ হয়েছে ১৪২৪ বঙ্গাব্দের। কিন্তু অনেক ঘটনাবহুল ১৪২৩ বঙ্গাব্দ। এই বছরেই দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন সূর্যোদয় ঘটে। দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিপুল ভোটে জয়লাভ দেশের রাজনৈতিক গতিপথ নতুন করে তৈরি হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও এর ব্যতিক্রম নয়, গেরুয়া দলের ক্রমশ উত্থান ঘটছে। যে দল একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে সাইনবোর্ড সর্বস্ব ছিল, সেই দল ক্রমশ জনশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষের বিশ্বাস লাভ করে চলছে বিধানসভায় একজন সদস্য না থাকা সত্ত্বেও। আমরা যদি ২০১৫ সালের ১৩ নম্বর প্রতাপগড় বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখি তখন দেখা যাবে ওই আসনে সিপিআইএমের রামু দাশ মোট ২৭ হাজার ৫৫৫ ভোট পেয়ে জয়ী হন। অবশ্য বিজেপি ১০ হাজার ২২৯টি ভোট পেয়ে এই আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। কংগ্রেস মাত্র ৫ হাজার ১৮৭টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে। ওই আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় ২০১৫ সালের ৩০ জুন। শুধু তাই নয়, ২০১৬ সালের অমরপুর বিধানসভা আসনের উপ নির্বাচনে সিপিআইএম ২০ হাজার ৩৫৫ ভোট পেয়ে জয়ী হয় এবং বিজেপি ৯ হাজার ৭৫৮টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। কংগ্রেস মাত্র ১ হাজার ২৩১টি ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করে। কেননা এখন ত্রিপুরা কংগ্রেস ভবনে ভাঙা হাটের মতই কেউ কেউ মাঝে মধ্যে এসে শুধু প্রদীপ জ্বালিয়ে যান। শাসক সিপিএমের সঙ্গে শুধু অমরপুর ও প্রতাপগড় নয় সালেমা এবং বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি দ্বিতীয় স্থান পায়।

এক কথায় বিজেপির উত্থান হচ্ছে ত্রিপুরায়। আর বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা ২০১৮-কে পাখির চোখ করে ত্রিপুরায় ঘুঁটি সাজানোর প্রক্রিয়া আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হিন্দু সংগঠনগুলি। ত্রিপুরায় কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা বলা চলে। বিজেপির এই উত্থানের অন্যতম কারণ হচ্ছে সিপিএম দলের দলতন্ত্র। দলের ক্যাডার না হলে সরকারি সাহায্য বা সহযোগিতা পাওয়ার কথা ভাবাই দুরূহ ব্যাপার। রাজ্যের ক্ষুব্ধ মানুষ এতদিন নির্ভরযোগ্য দল পায়নি। তাই এখন প্রতিদিন নিয়ম করেই কংগ্রেস, তৃণমূল এমনকী সিপিএম থেকেও মানুষ বিজেপিতে যোগদান করছেন। ক্রমেই বামবিরোধী শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠে আসছে বিজেপি। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কেন্দ্রের কোনো না কোনো মন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে আসছেন।

বিজেপি ত্রিপুরা নিয়ে যে কত সিরিয়াস তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় অতি সম্প্রতি লোকসভায় ত্রিপুরা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিজেপি সাংসদ পুনম মহাজন। তিনি লোকসভায় ত্রিপুরায় নারী নির্যাতন এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে হিন্দু সংগঠনগুলি হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার কাজ নীরবে করে যাচ্ছে। আখেরে লাভ হচ্ছে বিজেপির। তাই আজ বিজেপি ঘোষণা করছে একাই লড়বে ত্রিপুরার ৬০ আসনে। ইতিমধ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন আগামী ৮/৯ মাস নিরলস কাজ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন বিজেপি দলের নেতা-কর্মীরা। 'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা'-কে সামনে রেখে বিজেপি নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

পরিশেষে, ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার গঠন করবে কি না বলা এই মুহূর্তে কঠিন। কিন্তু এই কথা জোর দিয়েই বলা যায় কমিউনিস্টদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে বিজেপি। সঠিক উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হবে, আগামী ইংরেজি শুভ নববর্ষের।

(নিবন্ধকার পেশায় আইনজীবী)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

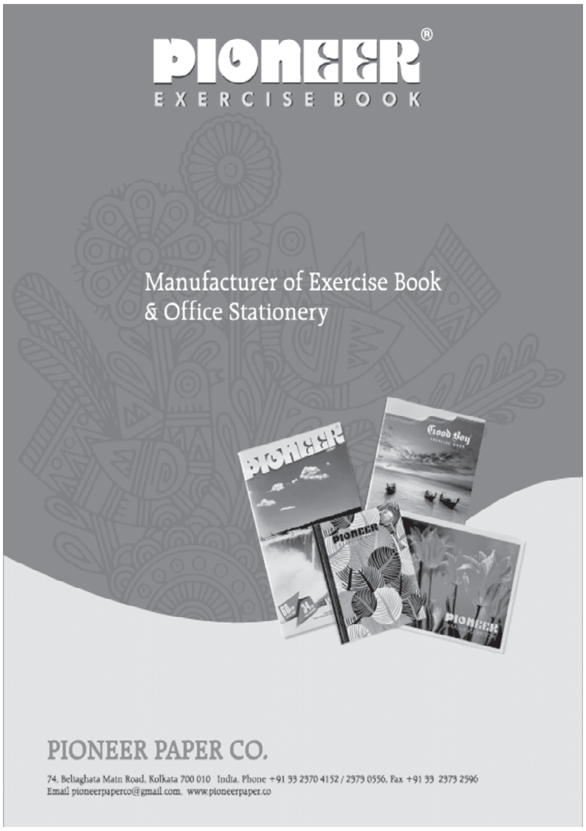

"শ্রীরামকৃষ্ণে আমরা হিন্দুধর্মের আদর্শ অতীতে কী ছিল তারই প্রকাশ দেখি। অতীত আদর্শ বর্তমানে কি রূপ নেবে, তাই দেখি বিবেকানন্দ-জীবনে। একটি জীবনের পশ্চাতে আরেকটি জীবন, যেন পরবর্তীকে যথার্থ তাৎপর্য দানের জন্য দণ্ডায়মান। এক অচ্ছেদ্য বন্ধন এই দুই জীবনকে মিলিত করেছে। মুদ্রার এপিঠে সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিপরীত দিকে নব্যশিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত বিবেকানন্দ।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দলাই লামার তাওয়াং সফরে চীনের হুমকি

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতিহাসে প্রথমবার এশিয়ার দুটি বৃহৎ দেশ নীতির ভিত্তিতে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে আবদ্ধ হলো'— ১৯৫৪ সালের ২৯ এপ্রিল চীনা প্রধান চৌ এন লাই-এর সঙ্গে 'পঞ্চশীল চুক্তি' করে তিব্বতের সম্পত্তি এবং তিব্বতের উপর ভারতের অধিকার নিঃশর্তে চীনের হাতে তুলে দিয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই কথাগুলি বলেছিলেন। এই চুক্তি সংসদে পেশ করে নেহরুজী বিপ্লবী মেজাজে বলেছিলেন— 'আমরা পছন্দ করি বা না করি, আমাদের মানতে হবে যে, সম্প্রতি বিশ্বের যত বড় ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো চীনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন।' নেহরুজী পঞ্চশীল চুক্তিকে এই বলে বর্ণনা করেছিলেন যে, 'কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না, কেউ কারোও সঙ্গে যুদ্ধ করবে না... এই মূল নীতির ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে।' চীন যখন সদ্য সদ্য তিব্বত আক্রমণ করছে সে সময় নেহরু পঞ্চশীল নিয়ে মন্তব্য করেন যে, 'আমার মতে, স্বাধীনতার পর আমরা এর থেকে ভালো কাজ করিনি... আমি মনে করি ভারতের জন্য, এশিয়ার জন্য এবং বিশ্বের জন্য এটা সঠিক সিদ্ধান্ত।' এই চুক্তির আট বছর পর নেহরু-বিরোধীদের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে চীন ভারত আক্রমণ করে বসে।

১৯৫১ সালেই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রাখার সময় বাবাসাহেব আম্বেদকর সতর্ক করে দিয়ে বলেন— 'ভারত একটা শক্ত বিদেশনীতি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। চীন তিব্বতে সেনা মোতায়েন করেছে; যেটা ভারতের কাছে একটা লম্বা সময়ের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।' বাবাসাহেবের মন্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক। দলাই লামার সাম্প্রতিক তাওয়াং সফরকে ঘিরে নতুনভাবে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তাঁকে

তাওয়াংয়ে ঢোকার অনুমতি দেবার জন্য চীন ভারতকে রীতিমতো শাসিয়েছে। ভারতও মনোভাব প্রকাশ করেছে যে, এটা নিছকই একটা ধর্মীয় সফর, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগ নেই। চীনের এই রাগ-ক্ষোভ তার চলতি কূটনীতির অঙ্গ হিসেবে দেখাই যুক্তিযুক্ত হবে। বাবাসাহেবের এই দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তাঁর একটা বলিষ্ঠ রাষ্ট্র ও বাস্তববাদী বিদেশনীতির চিন্তা থেকেই তৈরি হয়েছে। জাত-পাত দীর্ণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বিধ্বস্ত ও অপমানিত হয়েও তাঁর মন থেকে রাষ্ট্রচিন্তা মুছে যায়নি। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভারতের শক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বিশ্বরাজনীতিতে ভারতের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য এটাকেই তিনি একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে এমনটা হয়ে ওঠেনি। নেহরুর বিদেশনীতি, বিশেষ করে চীন ও সাবেক রাশিয়া নিয়ে তাঁর বিদেশনীতির প্রতি আম্বেদকরের একটা অশ্রদ্ধার মনোভাব ছিল। তিব্বতকে তিনি একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে কাঠমাণ্ডুতে বক্তৃতায় হিমালয় সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির প্রতি চীনের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। দীর্ঘ ছয় দশকে তাঁর আশঙ্কা প্রমাণিত হয়েছে। বিদেশনীতিতে চীনের জুলুমবাজির কাছে ভারত চুপসে মেনি বেড়াল হয়েছিল। চীন অরুণাচল প্রদেশের ৯০,০০০ বর্গকিলোমিটার তাদের বলে বরাবর দাবি করে এসেছে এবং জম্মু-কাশ্মীরের ৩৮,০০০ বর্গকিলোমিটার অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে অরুণাচলের রেজাংলা ও তাওয়ান দখল করে নেয়। বর্তমান ভারত সরকার কিন্তু বাবাসাহেবের নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চীন সফরে গিয়ে মোদীজী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সুনির্দিষ্ট করার উপর নজর দেবার কথা বলেছেন। নরেন্দ্র মোদীই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেপাল-ভুটান সফর করেছেন। তিনি

হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতের বিদেশনীতিকে বলিষ্ঠ করতে এটা একটা বড় পদক্ষেপ যার জেরেই চীন এতটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে।

বিজেপি সরকার একটা দীর্ঘকালীন নীতিকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এতকাল যার অভাব ছিল। মনমোহন জামানার শেষ দিকটায় ভারতের কূটনীতির সঠিক কোনো দিশা ছিল না। কিন্তু মোদী নীতিতে চীন বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। চীন দ্বি-মুখী কৌশল নিয়েছে। একদিকে ঠাণ্ডা ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিব্বতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংস করছে, আর অন্যদিকে দলাই লামার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করছে যাতে করে তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন নেতৃত্বহীন ও দিশাহীন হয়ে পড়ে। ২০১৫-তে তিব্বত নিয়ে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে চীন বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চেয়েছে যে কীভাবে সে তিব্বতের চারণভূমিগুলোকে উন্নত শহর বানিয়ে দিয়েছে। চীন এও দাবি করেছে যে তিব্বতের সনাতনী সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শ্বেতপত্রে আনুষঙ্গিক তথ্য দিয়ে সেখানে ৫০ বছর ধরে চীনা শাসনের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এইসব তথ্য যদি ঠিক হয় তবুও এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি সমানভাবে বিভ্রান্তিকর। তিব্বতি সমাজের মানুষগুলোকে দিনের পর দিন মেরে ফেলা হয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন করে তাঁদের গোলাম বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাসের দ্বৈত সত্তা ও পরম্পরাগত পেশা পশুচারণকে কমিউনিস্ট রাজত্বে জোর করে ধ্বংস করা হয়েছে। তিব্বতকে সুপরিকল্পিতভাবে দুভাগ করে দেওয়া হয়েছে। একটা অংশ, স্বশাসিত তিব্বত অঞ্চল যাকে নিউক্লিয়ার ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলা হয়েছে যেখান থেকে ক্যানসারের মত মারণ রোগ ছড়াচ্ছে। হাজার হাজার তিব্বতিকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। চীনা হান সম্প্রদায়কে স্বশাসিত তিব্বত অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করানোর কারণে তিব্বতিরা নিজভূমিতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। চীন তার ২০২০ প্রকল্পে আরও বেশি সংখ্যায় হানদের তিব্বতে ঢোকানোর ছক কষেছে। এতে চীনের সন্ত্রাসের শাসন আরও মজবুত হবে আর তিব্বতি সংস্কৃতির যে গণহত্যা চলছে তা আরও খারাপ আকার ধারণ করবে।

ভারত বরাবরই একটা সমনীতি নিয়ে চলেছে। তিব্বত যে চীনের অংশ সেটা বার বার বলে এসেছে। বিদেশমন্ত্রী হিসেবে অটল বিহারী বাজপেয়ী ১৯৭৯ সালে তাঁর চীন সফরে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই ভারত দলাই লামাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাধারণ তিব্বতিদের সম্পূর্ণ মানবিকতার খাতিরে উদ্বাস্তু হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চীন সবসময় তিব্বতের বিষয়কে সামনে রেখেই ভারতের যে-কোনো পদক্ষেপকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। মোটের উপর তিব্বতকে নিয়েই সবসময় ইন্দো-চীন সম্পর্কে ভাঙা-গড়া চলেছে। কোনো ঐতিহাসিক বা নীতিগত কারণে নয়, কৌশলগত কারণেই চীন তিব্বত দখল করেছে। ১৯৫৯ সালে তিব্বত বিদ্রোহ এবং তার তিন বছর পর দু'দেশের সীমারেখা নিয়ে ইন্দো-চীন যুদ্ধের পর চীনের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে তিব্বতের যথেষ্ট কূটনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৮৯ সালের তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ছাত্র আন্দোলন দমনকারী কুখ্যাত পিপল্স্ লিবারেশান সেনাদের পূর্ব তিব্বতে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে চীনা সরকার সেখানে রাস্তা-ঘাট বানাতে শুরু করেছে। গত দু'দশক ধরে চীন সেখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই উন্নয়ন করে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে তিব্বতে যা কিছু উন্নয়ন চীন সরকার করেছে, তা হয় যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত, নয়তো সেনাবাহিনী সংক্রান্ত। তিব্বতে বাইরের কোনো শক্তি পাছে ঢুকে পড়ে এ নিয়ে চীন সবসময় আতঙ্কিত। তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে চীন মায়ানমার ও নেপালের সঙ্গে ১৯৬০ সালে, মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে ১৯৬২ সালে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৬৩ সালে সীমান্ত চুক্তি করেছে। চুক্তি করে চীন ১৯৬৩-র ২ মার্চ পাকিস্তানের থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার আদায় করে নিয়েছে।

চীনের তিব্বত নীতিতে ভারতের নিরাপত্তা দু'ভাবে ব্যাহত হয়েছে। এক, ভারত-চীনের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা জটিলতর হয়েছে যার জেরে ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হয়েছে। চীনের তিব্বত দখলের কারণে ভারত-চীনের মধ্যে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রক ভূখণ্ডের পরিধিটাও কমে এসেছে। দুই, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের দাদাগিরি বেড়েছে। নেপালের সঙ্গে চীনের ৮৭০ মাইলের সীমারেখা রয়েছে এবং চীন নেপালের সঙ্গে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করছে। তিব্বতে চীনের উন্নয়ন নীতির কারণে ভারতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে, কেননা ভারতের বেশিরভাগ বড় নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে বনসম্পদের পরিমাণ কমে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তিব্বতের প্রাচীন সংস্কৃতি বিশ্বের বৃহত্তম নদীগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই নদীগুলি থেকে যেমন এশিয়ার ৮৫ শতাংশ মানুষ স্বচ্ছ জলের জোগান পায়, তেমনি পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ এই নদী অববাহিকায় বাস করেন।

চীনের সঙ্গে ভারতের ৩৪৮৮ কিলোমিটার অমীমাংসিত সীমারেখা রয়েছে যা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নামে পরিচিত। তাই চীনের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ভারতের কোনো বিকল্প উপায় নয়, কৌশলগত প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে দলাই লামা অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। মোদীজী এই ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভারত— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া— মধ্য এশিয়া এই বলয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটা যোগ সূত্র তৈরি করতে চান। অন্যদিকে চীন এই বলয়ের অভিমুখ বদলে দিয়ে নিজের পক্ষে টানতে চেষ্টা চালাচ্ছে। তিব্বত হলো এই কূটনীতির চালিকাশক্তি আর দলাইলামা হলেন তার আধ্যাত্মিক সংঘটক। বাবাসাহেবের কথাগুলো মাথায় রেখে মোদীজী তিব্বত ও তিব্বতিদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর। এটা শুধু তিব্বতিদের স্বার্থেই নয়, এর সঙ্গে ভারতের স্বার্থও জড়িয়ে রয়েছে। ■

দোসর পাকিস্তান তবু নিঃসঙ্গ চীন

প্রণয় রায়

অন্যের জন্য ফাঁদ পাততে গিয়ে নিজেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে চীন। একদিকে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হুঙ্কার অন্যদিকে মহাশক্তি হওয়ার প্রবল বাসনায় চীন আজ প্রায় নিঃসঙ্গ। আপাত দৃষ্টিতে বহু রাষ্ট্রই চীনের সঙ্গে নানা বন্ধুত্বপূর্ণ সন্ধিতে আবদ্ধ কিন্তু একটু কুটনীতির সামিয়ানায় খোঁজ নিলে দেখা যাবে এগুলির বেশিরভাগটাই বাণিজ্যিক লাভ লোকসানের ইঁদুর দৌড় মাত্র। চীনের উগ্র আগ্রাসী মনোভাব দুনিয়াবাসীকে চীন সম্পর্কে বিরূপ করে তুলেছে। এমনকী বাণিজ্যিক সম্পর্কেও তার প্রতিফলন ধীরে ধীরে ঘটছে বলে ওয়াকিবহালমহলের দাবি। এখানেই ভারতবর্ষের জন্য সুযোগের দরজা খুলে গেছে। সবচেয়ে জনবহুল দুই দেশের মধ্যের সম্পর্ক ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের পরে তলানিতে ঠেকে গেছে। ভারতের বন্ধুত্বের হাতকে চীন ভারতের দুর্বলতা বলে মশকরাও করে।

মুক্ত অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে এখন চীন ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। সেখানে পাল্লা চীনের ভারী অর্থাৎ ভারত যত রপ্তানি করে চীনকে, তার কয়েক গুণ বেশি আমদানি করে চীন থেকে। অর্থনীতির ভাষায় ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতি অনেকটাই। চীনে কমিউনিস্ট শাসন। ফলে না আছে শ্রমিক অধিকার আর না আছে দাবি-দাওয়ার আন্দোলন, না আছে জমি আন্দোলন, না আছে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা। ফলে সস্তা শ্রম ও স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট শাসনের দৌলতে সেখানকার তৈরি দ্রব্য সস্তা। ফলে চীন হয়ে ওঠে বিশ্বের কারখানা।

বিগত তিন দশক চীনের বৃদ্ধির হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ছিল। সেই সঙ্গে বাড়ছে দেশটির আর্থিক ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা খরচ। ফলে সমানতালে বেড়েছে তার আগ্রাসী মনোভাব। চীন জানে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার স্বাভাবিক নেতা। ফলে বার বার ভারতকে হেয় করে এলাকায় নিজের প্রভাব বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কখনও অরুণাচল প্রদেশকে নিজের রাজ্য দেখিয়ে তো কখনও পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে মদত দিয়ে। ৯০-এর দশক থেকে ভারতে চলেছে রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। একের পর এক প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে। মধ্যে অটলবিহারী বাজপেয়ীর কালখণ্ড ছাড়া ভারতের শাসক সিদ্ধান্তহীনতার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বাজপেয়ী সরকারও ছিল ২৪ দলের জোট। ফলে সরকারের পক্ষে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল যথেষ্ট কঠিন। মনমোহন জমানায় সরকার চলত সোনিয়া গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে। এক্ষেত্রে সরকারে শক্তির দুটি ভরকেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও সোনিয়া গান্ধীর বাড়ি। এ ধরনের দুর্বল শাসকের পক্ষে চীনের আগ্রাসী মনোভাবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াটা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। ফলে চীনের সাহসও দিন দিন বেড়েই চলেছিল। বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামার অরুণাচল ভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে চীন ভারতকে হুমকি দিয়েছে। অরুণাচলের ৬টি স্থানের নাম পালটে দিয়ে নতুন নামকরণ করেছে। বার বার ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রবেশ করে নিজ শক্তি জাহির করেছে। সেই সঙ্গে মিয়ানমার, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের সঙ্গে সৈন্য সমঝোতা করে ভারত মহাসাগরে ভারতের জন্য মুক্তামালার ফাঁস তৈরি করে ফেলেছে চীন।

তাজাকিস্তান, ভুটান, সেসলিস, মাদাগাসকার, মালদ্বীপ, মরিশাস-এর মতো দেশে ভারতের সৈন্য পরিকাঠামো রয়েছে। তাজাকিস্তানে তো বড় বায়ুসেনা শিবির রয়েছে ভারতের। এখানেই চীনের ভয়। তাদের একমাত্র বন্ধু পাকিস্তান। তাই তারা সরাসরি ভারত বিরোধিতা না করে পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।

২০১৪ সালে ভারতে বিজেপি সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নাটকীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভারতের মতো বৃহৎ জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশে মজবুত ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ নেতৃত্বের উদয়ে চীন-বিরোধী শক্তিগুলির বুকে নতুন আশার আলো জোগায়। সুযোগ বুঝে ময়দানে নেমে পড়ে আমেরিকা ও জাপানের মতো বৈরী দেশগুলি। বিশ্ব কূটনীতির ঘুটি নতুন ভাবে সেজে ওঠে। সুযোগ বুঝে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ভারতবর্ষের জন্য এশিয়ার নেতৃত্ব ও বিশ্বশক্তির মর্যাদা সংগ্রহে নেমে পড়েন। মোদীজী নিজ শাসনের একদম শুরুতেই একে একে সেরে ফেলেন ভুটান (জুন, ২০১৪), নেপাল (আগস্ট, ২০১৪), জাপান (আগস্ট ও সেপ্টেম্বর, ২০১৪), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (সেপ্টেম্বর, ২০১৪-১৫), অস্ট্রেলিয়া (নভেম্বর, ২০১৪), ফিজি (নভেম্বর, ২০১৪), সেসেলস (মার্চ, ২০১৫), মরিশাস (মার্চ, ২০১৫), শ্রীলঙ্কা (মার্চ, ২০১৫), সিঙ্গাপুর (মার্চ, ২০১৫ ও নভেম্বর, ২০১৫), মঙ্গোলিয়া (মে, ২০১৫), দক্ষিণ কোরিয়া (মে, ২০১৫), বাংলাদেশ (জুন, ২০১৫), উজবেকিস্তান (জুলাই, ২০১৫), কাজাখাস্তান (জুলাই, ২০১৫), রাশিয়া (জুলাই, ২০১৫), তুর্কমেনিস্তান (জুলাই, ২০১৫), কিরগিজিস্থান (জুলাই, ২০১৫), তাজাকিস্তান (জুলাই, ২০১৫), মালেশিয়া (নভেম্বর, ২০১৫), আফগানিস্তান (ডিসেম্বর, ২০১৫), ইরান (মে, ২০১৫), ভিয়েতনাম (সেপ্টেম্বর, ২০১৬), লাওস (সেপ্টেম্বর, ২০১৬)-এর সফর। এছাড়া রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী সফর করেন পাপুয়া নিউগিনি (এপ্রিল, ২০১৬), নিউজিল্যান্ড (এপ্রিল, ২০১৬), উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি খান ব্রুনেই, থাইল্যান্ড, মালি, কম্বোডিয়া, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ যান নেপাল ও মিয়ানমারে। এই কালখণ্ডে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উষ্ণ করতে ভারত সফরে আসেন মালদ্বীপ, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, বাহরিন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, রাশিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, তাজিকিস্তান, কিরাগজস্থান, ভুটান, মায়নমার, সেসেলস ও জাপানের মতো চীনের প্রতিবেশীদেশের রাষ্ট্রনেতারা।

এছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, বিদেশমন্ত্রী বহুদেশের সফর সারেন। ভারতে আসেন আরও বহু দেশের রাষ্ট্রনেতারা। চীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই কর্পোরেট বম্বিং বোঝার আগেই ভারত-আমেরিকার মধ্যে প্রতিরক্ষা সন্ধি হয়ে যায়। এর পরেই দক্ষিণচীন সাগরের আধিপত্য নিয়ে চীনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে তার প্রতিবেশী ভিয়েতনাম, মালেশিয়া, ফিলিপিন্স-এর মতো দেশগুলি। দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতেও চীন মুখ থুবড়ে পড়ে।

২০১৫ ও ২০১৬ সালে আয়োজিত যৌথ সামরিক মহড়া

নাম	দেশ
মিত্র শক্তি	ভারত-শ্রীলঙ্কা
ইন্দ্র	ভারত-রাশিয়া
সূর্য কিরণ	ভারত-নেপাল
লামিচিয়ে	ভারত-সেসেলস
মান্টি নেশনল এফটিএস	আশিয়ান দেশ ও ভারত
গুরুডা শক্তি	ভারত-ইন্দোনেশিয়া
নোমাডিক এলিকেন্ট	ভারত-মঙ্গোলিয়া
মৈত্রী	ভারত-থাইল্যান্ড
প্রবাল দেলাটক	ভারত-কাজাকিস্তান
যুদ্ধ অভ্যাস	ভারত-আমেরিকা
সম্প্রীতি	ভারত-বাংলাদেশ
একুভেরিন	ভারত-মালদ্বীপ
বোল্ড কুরুক্ষেত্র	ভারত-সিঙ্গাপুর
সেহযোগ-কাইজিন	ভারত-জাপান

অন্যদিকে দুর্নীতি ও লাল ফাঁস মুক্ত প্রশাসনের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস বিশ্ব বাণিজ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভারতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী করে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীও ঘোষণা করেছেন, 'এবার ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের কারখানা'। শুরু করেন মেক ইন ইন্ডিয়া কার্যক্রম। এক্ষেত্রেও দেখা যায় চীনকে সরিয়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও দ্রুত বৃদ্ধির হার যুক্ত দেশ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ও মায়ানমারে ভারতীয় সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

চীন কিন্তু পিছু হটতে নারাজ। চীনের প্রতিরক্ষা বাজেট প্রায় ১৪১ বিলিয়ন ডলার, যেখানে ভারতের মাত্র ৪০ বিলিয়ন ডলার। চীনের মোট সক্রিয় বাহিনীর পরিমাণ ২২ লক্ষ, যেখানে ভারতের ১৩ লক্ষ। এক্ষেত্রেও জোট রাজনীতির চাণক্য বাজপেয়ীজীর পথ অনুসরণ করে ভারত। চীনের প্রত্যেকটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যৌথ সামরিক মহড়া দুই দেশের সম্পর্ককে আরও উষ্ণ করে তুলেছে— এটাই কপালে ভাঁজ ফেলেছে চীনের।

ফোর্স-১৮ যুদ্ধ মহড়ায় ভারত-সহ ১৮টি মহাশক্তি অংশ নেয়। এছাড়া ভারত, আমেরিকা, জাপানি নৌসেনা প্রতি বছর নানা সময় যুদ্ধ মহড়া করে। দক্ষিণ চীন সাগর এখন ভারতীয় রণতরীগুলির অবাধ ক্ষেত্র।

বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশ যাদের নিজভূমি ছাড়া অন্য দেশেও সৈন্যে ছাউনি রয়েছে তার মধ্যে ভারতও আছে। তাজাকিস্তান, ভুটান, সেসলিস, মাদাগাসকার, মালদ্বীপ, মরিশাস-এর মতো দেশে ভারতের সৈন্য পরিকাঠামো রয়েছে। তাজাকিস্তানে তো বড় বায়ুসেনা শিবির রয়েছে ভারতের। এখানেই চীনের ভয়। তাদের একমাত্র বন্ধু পাকিস্তান। তাই তারা সরাসরি ভারত বিরোধিতা না করে পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।

এবার হয়তো সে গুড়ে বালি পড়বে। কারণ ভারত গাদাফি বন্দরের জবাব চারবাসা বন্দর দিয়ে দিতে শিখে গেছে। ■

প্রসঙ্গ দলাইলামা

চীন ভারতের কী ক্ষতি করতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিষয়টা এরকম নয় যে, চীন আর ভারতের সম্পর্ক আগে খুব ভালো ছিল। কিন্তু তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার সাম্প্রতিক অরুণাচল প্রদেশ সফরের পর সম্পর্ক যে খারাপ হয়েছে সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বন্ধুত্বের মুখোশ সরিয়ে রেখে চীন হুমকির পর হুমকি দিতে শুরু করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ভাষা তারা ব্যবহার করেছে তাতে তাদের আগ্রাসী মনোভাবও বেশ স্পষ্ট।

অনেকে হয়তো বলবেন আগ্রাসী কথাবার্তা মানেই সামরিক আগ্রাসন নয়। বিশ্ব-মানচিত্রে বন্ধুহীন— প্রায় একঘরে হয়ে পড়া চীন সুযোগ পেলে যে ভারতকে আক্রমণ করবে না এরকম গ্যারান্টি বোধহয় কেউ দিতে পারবে না। চীন ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে তারা যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পিছপা হবে না। চীনের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র 'দা গ্লোবাল টাইমস' লিখেছে, দলাই লামাকে অরুণাচলে যাবার অনুমতি দিয়ে ভারত চীনের মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছে। অন্যদিকে ভারত যেহেতু চীনের হুমকিকে 'স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ' বলে প্রচার করেছে তাতে চীন রেগে গিয়ে বলেছে, তাদের উপেক্ষা করলে ভারতকে আখেরে পস্তাতে হবে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে চীন ভারতের কী ক্ষতি করতে পারে।

ক্ষতি-১

চীন আকস্মিক সেনা অভিযান করতে পারে। এবার সম্ভবত লাদাখে নয়, অরুণাচলে। তবে সেরকম কিছু হলে তা হবে নেহাতই অবিবেচনা প্রসূত প্রতিক্রিয়া। ভারত সেটা ভালোই জানে। কারণ এই মুহূর্তে চীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভালো জায়গায় নেই। বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুবই খারাপ। তাই যে-কোনো ধরনের সামরিক অভিযান দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে পরিণত হবে এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সমর্থন থাকবে ভারতের পক্ষে। সোজা বাংলায়, চীন কেঁদেও কূল পাবে না।

ক্ষতি-২

চীন ভারতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে পারে। সেটাও হবে অরুণাচল প্রদেশে। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে লাভ কী? বিশেষ করে যেখানে অরুণাচলে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা আর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সমার্থক। তাছাড়া এত তুচ্ছ কারণে কোনো সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা যুদ্ধ ঘোষণা করলে যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই চীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একঘরে হয়ে পড়বে।

ক্ষতি-৩

পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে চীন বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। কিন্তু তাতে চীনেরই লোকসান। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চীন থেকে পণ্য আমদানি করতে না পারলে অন্য কোনো দেশ থেকে করবেন। কয়েক মিলিয়ান ডলার হাতছাড়া হবে চীনের। আর্থিক বৃদ্ধিতে ভারতের থেকে এগিয়ে থাকা দেশ হিসেবে চীন ওই ক্ষতি কিছুতেই মেনে নেবে না।

ক্ষতি-৪

এসব কিছুই না করে চীন স্রেফ পাকিস্তানকে আরও কাছে টেনে নেবে। এমনিতেই দু'দেশের সম্পর্ক বেশ মধুর। সম্প্রতি চীন পাকিস্তানকে ফাইটার এয়ারক্র্যাফ্ট এবং সাবমেরিন বিক্রি করেছে। ভারতের আপত্তি উপেক্ষা করে কাজ চলছে চীন-পাকিস্তান ইকনোমিক করিডোরের। তাই পাকিস্তানের মতো দেশের সাহায্যে ভারতকে পিছন থেকে ছুরি মারার কৌশলই হবে চীনের পক্ষে সহজতর কূটনীতি। এ কাজ তারা অনেকদিন ধরেই করে আসছে। ভারত এসব কথা জানে বলেই চীনের হুমকিকে পাত্তা দেয়নি। অবস্থা বেগতিক দেখে চীনও একেবারে স্পিকটি নট হয়ে গেছে।

এই সময়

প্লাস্টিকের জরায়ু

এতদিন একটা ধারণা ছিল বিজ্ঞান আর যাই করুক মাতৃগর্ভের কোনো বিকল্প তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার শিশু

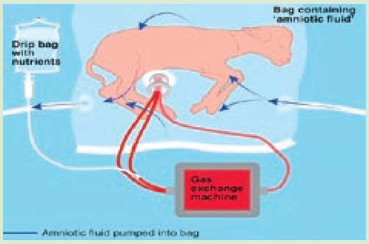

হাসপাতালের গবেষক-চিকিৎসক অ্যালান ফ্লেক ধারণাটি পাল্টে দিয়েছেন। এমন এক প্লাস্টিকের জরায়ু তিনি তৈরি করেছেন যেখানে সময়ের আগে চলে আসা শিশু দিব্যি আরামে থাকবে।

সারমেয় দৌরাত্ম্য

কুকুরের দৌরাত্ম্যে আমেরিকার কানেকটিকাট

অঞ্চলের মানুষ চিঠিপত্র পাচ্ছেন না। ডাকপিয়োন দেখলেই একদল কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কামড়ও খেয়েছেন কয়েকজন। তাই চিঠি বিলি আপাতত বন্ধ। এলাকা সারমেয়শূন্য হলে আবার শুরু হবে।

চুল কাটতে কুড়ুল

রাশিয়ার সাইবেরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত নভোসিবিরস্ক শহরের হেয়ার-ড্রেসার ড্যানিল ইস্টোমিন চুল কাটতে কুড়ুল ব্যবহার করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে

ড্যানিলকে কুড়ুল দিয়ে এক মহিলার চুল কাটতে দেখা গেছে। ড্যানিলের যুক্তি, কাঁচির থেকে কুড়ুল ব্যবহার করা সহজ।

সমাবেশ -সমাচার

মমতার গুহায় অমিতের গর্জন

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বিজেপির সভাপতি অমিত শাহের সফরকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই সফরে অমিত শাহ বেশ কয়েকটি সভা করেন। প্রথম সভা হয় শিলিগুড়িতে।

শিলিগুড়ি :

২৫ এপ্রিল শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার-হাজার দর্শকের উদ্দেশ্যে অমিত শাহ বলেন, 'আগামী নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবে।' বাংলার মাটিকে শহিদের মাটির সঙ্গে তুলনা করে তিনি সেই মাটিকে প্রণাম

উত্তরবঙ্গে অমিত শাহ।

শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মানুষের ঢল।

জানান। তারপর বলেন, 'এই মাটিতে জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। দীনদয়াল উপাধ্যায় সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ একবার বলেছিলেন, দু'জন দীনদয়াল পেলে আমি ভারতের ছবিটাই বদলে দেব।' অমিত শাহ জানান, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে দল বিস্তার যোজনা নিয়েছে। আগামী এক বছরে বিজেপির সাড়ে তিন লক্ষ কর্মী দেশের সাত লক্ষ বুথে যাবেন। বুথস্তরে এমনকী বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করবেন। এদিন তারই শুভারম্ভ হয় উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে। ৬০-র দশকে যেখান থেকে তাণ্ডবের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। এদিন অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সরকারের অপশাসনের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গের থেকে তৃণমূলী পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ। রাজ্যের মাথায় ঋণের বোঝা সাড়ে তিন লক্ষ

এই সময়

রাখে হরি...

রাজপথে মনের সুখে সে হামা দিচ্ছিল। মোটে দু'বছর বয়েস। তার ওপর দিয়ে হুশ হুশ করে পর পর দুটো গাড়ি চলে গেল। কিন্তু তার

কিচ্ছুটি হলো না। না, সিনেমা নয়। সম্প্রতি চীনে ঘটেছে ঘটনাটি। ট্রাফিক সিগন্যালের ক্যামেরায় ওঠা ছবি দেখে স্তম্ভিত সারা দুনিয়া।

পিয়ানো ভাঙার রীতি

ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির রীতি অনুযায়ী প্রতি বছর একটি

পিয়ানো ওপর থেকে নীচে আছড়ে ফেলা হয়। কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর এ বছর পালিত হয়েছে রীতি। ষষ্ঠ তল থেকে ফেলে ভাঙা হয়েছে একটি পিয়ানো।

আম আদমির উড়ান

দেশের সব থেকে সস্তা বিমান পরিষেবার

উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শিমলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এতকাল দেশে কোনো বিমান পরিবহণ নীতি ছিল না। আমরা প্রণয়ণের চেষ্টা করছি।

সমাবেশ -সমাচার

সভার শুরুতে পরিচয়পর্ব।

কোটি টাকার। ভ্রষ্টাচার আর দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা লুট হয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুরে চলছে হত্যালীলা। রোজগারের বাহানা করে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকছে। তবে এ ব্যবস্থা বেশিদিন চলবে না। আগামী নির্বাচনেই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করবে।' তাঁর এই দাবি জোরালো হয় এদিন উত্তরবঙ্গে

পরেরবার বিজেপিই ক্ষমতায় : অমিতের ঘোষণা।

তৃণমূলের প্রথম বিধায়ক অশোক মণ্ডল এবং শিলিগুড়ির ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মহানন্দ মণ্ডল বিজেপিতে যোগ দেওয়ায়। রাজনীতির সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত নন তারাও অমিত শাহকে নিয়ে আপ্লুত। যেমন দক্ষিণ কোটিয়াজ্যোতের কিশোরী করিশমা খাতুন। স্নাতকোত্তর স্তরের এই ছাত্রী নিজের বাড়িতে বসে এলাকার নানা সমস্যার কথা অমিত শাহকে জানিয়েছে। একই অবস্থা ভ্যানচালক ধীরেন সিংহেরও। লেখাপড়া শিখলেও

তাঁর ছেলেমেয়েরা কেউ চাকরি পাননি। এদিন অমিত শাহ, রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং জাতীয় কর্ম-সমিতির সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় মধ্যাহ্নভোজন সারেন চা-শ্রমিক রাজু এবং গীতা মহালির বাড়িতে। গর্বিত দম্পতি পরে জানান এই ঘটনায় তাঁরা অভিভূত।

কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা

এই সময়

পাইলটের বর্ণবিদ্বেষ

জেট এয়ারওয়েজের পাইলট বার্নড হোয়েসলিন একজন প্রতিবন্ধী যাত্রীর গায়ের রঙ নিয়ে অশোভন মন্তব্য করেছেন। ওই ফ্লাইটেরই আরও দু'জন যাত্রী অপমানিত হয়েছেন। সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছেন ক্রিকেটার হরভজন সিংহ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে করা টুইটে এর প্রতিকার দাবি করেছেন ভাজ্জি।

সবুজ নোবেল

সামাজিক ন্যায় আন্দোলনের নেতা এবং ওড়িশার বিখ্যাত সমাজসেবী প্রফুল্ল সামন্তরা

এবারের গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারকেই গ্রিন নোবেল বলা হয়। তৃণমূল স্তরের যেসব নেতা সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন তাদেরই এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

শতায়ু অ্যাথলিটের সোনা

নিউ জিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড মাস্টার গেমসে সোনা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ভারতীয় অ্যাথলিট ১০১ বছর বয়েসি মন কাউর। তিনি ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতেন। চার বছর অন্তর ওয়ার্ল্ড গেমস অনুষ্ঠিত হয়। বয়স ৩৫-এর বেশি হলে যে-কোনো খেলোয়াড় অংশ নিতে পারেন।

সমাবেশ -সমাচার

কলকাতায় অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক ভবানীপুরে দাঁড়িয়ে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ। সভার আগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলাগাম তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্যেই রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁরা বিকল্প হিসেবে দেখছেন বিজেপিকে। এই মুহূর্তে রাজ্য-রাজনীতির সব থেকে আলোচিত বিষয় সারদা-নারদ প্রসঙ্গে বিজেপি সভাপতির চ্যালেঞ্জ, 'সাহস থাকলে এই দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।'

গীতা মহালির বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ। সঙ্গে দিলীপ ঘোষ।

মমতার বহুচর্চিত 'চক্রান্তে'র অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'টিভিতেই দেখা যাচ্ছে ক্যামেরার সামনে কারা ঘুষ নিয়েছেন। এর পিছনে আবার কীসের চক্রান্ত! ইদানীং মমতা কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ মাঝে মাঝেই করে থাকেন। অমিত শাহের জবাব, 'হিম্মত থাকলে সঠিক হিসেব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আমায় চ্যালেঞ্জ করুন।' মমতার জমানায় রাজ্যে অনুপ্রবেশ আর বোমা তৈরির কারখানা ছাড়া আর কিছু বাড়েনি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বিকেলে ছিল মহাজাতি সদনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক। সেখানে তিনি বিজেপিকে একবার অন্তত সুযোগ দেবার অনুরোধ জানান। বিজেপিতেই একমাত্র অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র আছে বলে দাবি করে তার কটাক্ষ, সোনিয়ার পর কে, আপনারা জানেন। মমতার পর কে, তাও আপনারা জানেন। কিন্তু আমার পর বিজেপির জাতীয় সভাপতি কে, তা কি কেউ জানেন?' এদিন প্রেক্ষাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। সাহিত্যিক শঙ্কর এবং প্রাক্তন জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরি- সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। বাইরেও ভিড় উপচে পড়েছিল। ■

অতিথি কলম

চেতন ভগত

২০১৯-এর লোকসভা মোদীর জন্যই সংরক্ষিত

সদ্য উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের বিধানসভায় বিজেপির নির্বাচনী সাফল্য সত্যিই গগনচুম্বী। এই জয়ের বিশালত্ব সম্পর্কে নির্বাচন বিশারদ কেন, দলের মধ্যেও নিশ্চিত ধারণা ছিল না। দেখা যাচ্ছে, এই দুটি রাজ্যের ৪৭৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই দখল করেছে ৩৮১টি আসন যা শতাংশের হিসেবে ৮০ শতাংশের কিছু বেশি। অবশ্য অন্য একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিজেপির জন্য এমন সুখবর ছিল না। দল ও জোটসঙ্গী সংযুক্ত অকালি দল পঞ্জাবে বড়সড় হারের মুখ দেখেছে। অন্যদিকে মণিপুর ও গোয়ায় দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়েও কোনোমতে দু' রাজ্যেই ক্ষমতা দখলে সফল হয়েছে।

মোদী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে. চলতি জয়ের পর মোদী সরকার লোকসভার সঙ্গে রাজ্যসভাতেও শিগগিরই গরিষ্ঠতা অর্জন করতে চলেছে। সেই সুবাদে ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে তারা বেশ কিছু জনহিতকর বিলও পাশ করাতে পারে।

কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সর্বাত্মক জয় ছোটখাটো রাজ্যে হারের তুলনায় অনেক বড়। কেননা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মহীরুহসম উত্তরপ্রদেশে ৮০টি দল সংসদীয় আসন নিয়ে মাঠে নামবে। আর হিসেব করলে এই সংখ্যাটা পঞ্জাব (১৩), গোয়া (২), মণিপুর (২), এই তিনটে রাজ্য মিলিয়ে যা হয় তার প্রায় ৫ গুণ।

তাই রাহুল গান্ধীর গুণগ্রাহীরা যতই তার কানে কানে তেতো খবরটা মিষ্টির মোড়কে পরিবেশন করে বলুক না যে কংগ্রেস তেমন কিছু খারাপ করেনি— বাস্তবটা খুব সহজ; বিজেপি দুর্দান্ত ফলাফল করেছে। উত্তরপ্রদেশের এই জয় ২০১৯-এর লোকসভার জন্য বিজেপিকে যথেষ্ট সুবিধেজনক জায়গায় রাখল। প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিতে যাকে বলে একজন সফলতম নেতার দীর্ঘস্থায়ী মোহরও একলপ্তে দিয়ে দিল। ২০১৪ সালে ভোটদাতারা পরিবর্তন আনার জন্য মোদীকে ভোট দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বদলের অগ্রদূত। এবার মানুষ জানল যাঁর মাধ্যমে তারা পরিবর্তন এনেছে তাঁকে পেয়ে তারা সুখী।

এই প্রেক্ষিতে ২০১৭-র নির্বাচনী সাফল্য ২০১৪ সালের থেকেও বেশি তাৎপর্যময়। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার সময় মোদীর কাছ থেকে যে পর্বতপ্রমাণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা মেটাতে গিয়ে তাঁর পক্ষে কিছুটা হতাশ করাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আদতে তা হয়নি; বাস্তবে তাঁর জনপ্রিয়তা বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে রাজ্যগুলি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেখানে অটুট। মানুষ তাঁর কাজপাগলা স্বভাবকে ভালবাসে। সমগ্র দেশের সমাজে, অর্থনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন আনতে পারে এমন কিছু বিষয় নিয়ে তাঁর চিন্তা, বিশ্বের দরবারে ভারতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সদা মগ্নতাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। বিমুদ্রীকরণ ফলিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উপকার করতে সফল হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও রাজনৈতিকভাবে এটি তুমুল সফল।

ইত্যবসরে কংগ্রেস কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে যত বড় ভুল করা সম্ভব তা করে চলেছে— তারা মানুষের কথায় কান দিচ্ছে না। রাহুল গান্ধী কখনই ভারতীয় তরুণদের অনুপ্রেরণা দিতে পারেন না। দলের উচ্চতম নেতা হিসেবে তাঁর প্রভাব সম্পূর্ণ নেতিবাচক। সেই নিরিখে পঞ্জাবে অমরিন্দর সিংহের জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাহুল গান্ধী দলের প্রধান নেতা হলেও লোকে বলছে পঞ্জাবে অমরিন্দর জিতেছেন।

কেন্দ্রীয় মূল দলগুলি যখন রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা বা অবহেলা শুরু করল তখনই বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের জন্ম হয়েছিল। তারা কিন্তু এবার কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। অন্তত কিছু কিছু অঞ্চলে তো বটেই। বিজেপি ও মোদী

সম্পূর্ণ নিবিষ্টভাবে উত্তরপ্রদেশের দিকে নজর রেখেছেন। তাঁরা সব সময়ই মনে করেন এখানে রাজ্যের থেকেও অনেক বড় সংসদে যাওয়ার প্রধান পাসপোর্ট কার্যালয়ের গুরুত্ব। এর ফলে এমন দাঁড়িয়েছে যে কেন্দ্রীয় দল এমনভাবে রাজ্যের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারে ব্যস্ত যে ক্ষেত্রীয় দলগুলির আর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতাই থাকছে না অর্থাৎ সমাজবাদী, বহুজন সমাজ পার্টি প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। অবশ্য তাদের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জাতপাত অর্থে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটা ছাড়া। তবে নির্বাচনে জিততে যে পরিমাণ সমর্থন প্রয়োজন শুধু জাতের ভোট জুটিয়ে তা পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ, মহাপবিত্র (আম আদমি পার্টি) দলও সেই অর্থে এখন অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার নিয়ে পত্তন হওয়ার বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও সঙ্গে তার সরকারের কোনো ধরনের কেলেঙ্কারির দাগ না থাকায় তাদের ইস্যুতে টান পড়ছে।

এখন, বাড়তি শক্তিতে বলীয়ান মোদী, ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস, রাজ্যে রাজ্যে গুরুত্ব হারানো প্রাদেশিক দলগুলির আগামী লোকসভা ভোটে অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্ভাবনায় কি ২০১৯ সালের নির্বাচন সেই অর্থে মোদীর পক্ষে জলভাত হয়ে গেল। অবশ্যই নির্বাচন আসতে এখনও দু' বছর বাকি আছে। কিন্তু কংগ্রেস দলে সংস্কারের সম্ভাবনার শ্লথগতি ও প্রাদেশিক দলগুলির নতুন চিন্তা ভাবনার দৈন্যতা দেখে খুব একটা কিছু এর মধ্যে বদলাবে বলে তো মনে হয় না।

বাস্তবে মোদী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এমনটাই যেন মনে হয়। এই চলতি জয়ের পর মোদী সরকার লোকসভার সঙ্গে রাজ্যসভাতেও শিগগিরই গরিষ্ঠতা অর্জন করতে চলেছে। সেই সুবাদে ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে তারা বেশ কিছু জনহিতকর বিলও পাশ করাতে পারে। এগুলি জয়ের পথ সুগম করতে সহায়ক হবে। তবে কয়েকটি ঝুঁকি এখনও থেকে যায়। যেমন ২০১৬ সালের বিহার নির্বাচন। বন্যপ্রাণী বিশারদরা বলেন, বনের রাজা সিংহকে বাগে আনতে জঙ্গলের সব হায়নাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে কখনও কখনও অতর্কিত আক্রমণ চালায়। মাঝে মাঝে জিতেও যায়। বাজারে চালু মহাগঠবন্ধন বা সুযোগসন্ধানীদের জোট অর্থাৎ সব মোদী বিরোধী দল একত্র হয়ে মোদীর বিরোধিতায় নামতে পারে।

ভগবান না করুন এমন একটা পরিস্থিতি হলে অর্থাৎ এরা জিতে গেলে তা কিন্তু ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। হালকাভাবে বললে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দল ক্ষমতার ফল খেতে চাইবে। আর তাদের কারুরই কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না। কিন্তু এমন একটা দায়িত্বহীন জোট কিন্তু জিতেও যেতে পারে।

দেখা যাক, ব্যাপারটা কেমন। উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদীরা সঙ্গীদের নিয়ে ২২ শতাংশ ভোটাধিকারী, মায়াবতীও তাই মানে ২২ শতাংশ। বিজেপি পেয়েছে ৪০ শতাংশ। এখন এসপি ও বিএসপি যদি বিহারের কায়দায় কোনো 'হায়না প্ল্যান' তৈরি করত সেক্ষেত্রে তাদের অবস্থানটা অনেকটা ভাল হতো। অবশ্যই দল প্রধানদের ইগো এসব ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়। কোথায় ভেসে যায় পাটীগণিতের সম্ভাব্য আশা ভরসার অঙ্ক।

দ্বিতীয় বিপদটা রয়েছে মোদী সরকারের তরফে আত্মঘাতী গোলের সম্ভাবনা। যখন কেউ নতুন করে কোনো কিছু উদ্ভাবন করে বা কোনো পরিকল্পনা লাগু করতে চায় তখন কিছু ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। কোনো কিছু না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মোদী সরকার ঠিক সেই চরিত্রের নয়।

বিমুদ্রীকরণ রাজনৈতিকভাবে সফল হয়েছিল কিন্তু অন্য একটি সিদ্ধান্ত বিফল হতে পারে। একথা মাথায় রেখে রাজনৈতিকভাবে নতুন সিদ্ধান্তটি কতখানি ঝুঁকি প্রবণ হতে পারে সে ব্যাপারে সবিশেষ চিন্তাভাবনা করে তবেই তা কার্যকর করা উচিত।

অন্যদিকে নির্বাচকরা মোদী সরকারের নেওয়া নীতিগুলির রূপায়ণের সাফল্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি দায়বদ্ধতা দাবি করতে পারে। তবে ২০১৯ সালের আগে সেই পরিস্থিতি আসবে বলে মনে হয় না। সেই দায়বদ্ধতা ও এ জবাবদিহির প্রশ্ন উঠবে ২০২৪ সালে।

তাই বলছি, ছোট মাত্রার দু' একটা ঝুঁকি ছাড়া ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে মোদী নিষ্কন্টক। কানকে যথেষ্ট তৈরি রাখতে হবে এই স্লোগানটি অচিরে শোনার জন্য 'ফির একবার মোদী সরকার।' ■

চিঠিপত্র

রামনবমীর শোভাযাত্রা

গত ৭ এপ্রিল রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র প্রদর্শন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির মন্তব্য হলো ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অস্ত্র প্রদর্শনের ট্রাডিশন নেই। আমাদের ধারণা আমরা দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার ফলে আমাদের ভাবনা-চিন্তায় এক বিকৃতি ঘটেছে। ভারতবাসীর সভ্যতার ইতিহাস দীর্ঘ। মেহেরগড় সভ্যতা আট হাজার বছরের কম নয়। এই সভ্যতার ধারাবাহিকতা আছে। হরপ্পা সভ্যতার (৫৫০০-৩৩০০ বছর প্রাচীন) বহু উপাদান, বৈদিক সংস্কৃতির বহু মন্ত্র আজও আমাদের সংস্কৃতিতে কেবল বেঁচেই নেই, আমাদের সমাজধর্ম, রীতিনীতিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। সভ্যতার শুরু থেকে দেশে দেশে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রকৃতি পূজা, বহু দেবদেবীর পূজা, প্রাণীপূজা, পূর্বপুরুষ ও মহাপুরুষদের পূজা বহু যুগে বহু নারীপুরুষের আকাঙ্ক্ষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপত্তি ও বিকশিত হয়েছিল তারই একটি নাম সনাতন হিন্দুধর্ম, ইউরোপে পেগানিজম। পৃথিবীর সেই প্রাচীন ধর্মসংস্কৃতি সভ্যতা ভারতবর্ষেই আছে। আর কোনো দেশে প্রায় নেই বললেই চলে।

আমাদের মুনি-ঋষিরা যে সমাজ কাঠামো তৈরি করেছিলেন সেই কাঠামোর প্রথম স্থানে ব্রাহ্মণ (জ্ঞানের শক্তিদ্বারা সমাজ পরিচালন), দ্বিতীয় হলো ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বৈশ্য এবং চতুর্থ শূদ্র। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গই হচ্ছে ক্ষাত্রশক্তি। ক্ষাত্রশক্তি ব্যর্থ হলে কেউই রক্ষা পাবে না।

হিন্দুর দেবদেবীরা অস্ত্র হাতে। ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ দিয়ে তাড়কা রাক্ষসী ও রাবণকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সুদর্শনচক্র। তিনি কংস, জরাসন্ধ, পুতনা, কালিয়া, দুর্যোধন প্রভৃতিকে ধ্বংস করে। গীতায় বলা হয়েছে—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। (৮ : ৭)

অর্থাৎ 'সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাক।' যাঁরা বলেন হিন্দুদের অস্ত্র হাতে করার ট্রাডিশন নেই তাঁরাই বিপথগামী হিন্দুধর্ম বানাতে চায়। বীর শিবাজী, রাণা প্রতাপ, গুরুগোবিন্দ সিংহ, প্রণবানন্দ মহারাজ কি হিন্দু নন? তাঁকে কি তরবারি দিয়ে অরতি করা হয় না?

—**ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার,**
দমদম পার্ক, কলকাতা-৬৫।

বনবাসী সমাজের পরিবর্তন

আমারা সত্যিই সভ্য সমাজের বাসিন্দা হতে পেরেছি বলে মনে হয় না। কারণ স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও সেই আদিম সভ্যতাকে নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। দৈনতা, গ্লানি নিয়ে প্রতি মুহূর্তে বনবাসী সমাজের মানুষেরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করছে। প্রায় প্রত্যেকটা রাজ্যে জনজাতি সমাজের বসবাস আছে যা সবথেকে পুরনো মনুষ্য সমাজ। আমি ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে ভ্রমণ করেছি নানারকম কাজের জন্য। কিন্তু আমাদের রাজ্যের সীমান্ত জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় প্রায় গলিগলি ঘুরে বেড়িয়েছি বিভিন্ন তথ্যের সন্ধানে বা সমাজ চেতনার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজ চেতনাকে বৃদ্ধি করার কাজের মধ্যে এখনও আমি সর্বতোভাবে জড়িয়ে আছি। যেসব ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদ বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে বা সমস্ত রকম দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ করে তাদেরকে কোনোদিন সব থেকে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চনাপ্রাপ্ত মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর কোনো চেষ্টা বা আগ্রহ আমি বিগত ষাট বছরে দেখতে পাইনি। পশ্চিমবাংলায় বিগত তিন দশকের বেশি সরকারে থাকা দল শুধু সংগ্রামের কথা, শোষিত সমাজের কথা, বঞ্চনার কথা বলে এসেছে কিন্তু সমাধানের পথ খোঁজার জন্য চেষ্টা একবারও করেনি। ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে এক সমাজ চেতনাকে ধ্বংস করার কাজে যুক্ত রাজনৈতিক দল যেভাবে সমাজকে শোষণ করেছে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকেও কলুষিত করেছে যা ভবিষ্যতের দিনগুলি নতুন প্রজন্মকে সুস্থ সমাজের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে কিনা তা নিয়ে বেশ সংশয় আছে। এই সংগ্রামী সমাজের বিশেষভাবে পরিবর্তন দরকার আর সেই সীমারেখার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সেখান থেকে পিছিয়ে পড়া সমাজের মুক্তির প্রয়োজন। কেন সত্তর বছর স্বাধীনতার পর এখনও বনবাসী সমাজে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হচ্ছে? কেন এখনও পিঁপড়ের ডিম সিদ্ধ করে খেয়ে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে? কেন এখনও শিক্ষার আলো তাদের ঘরে পৌঁছতে পারলো না? কেন তাদের ঘরে কন্যাসন্তান হলে নানারকম ভাবে শোষণ করা হয়? কেন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো না? কেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত করা গেল না? কেন পানীয় জলের ব্যবস্থা করা গেল না? কেন সব বিষয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমাজকে শোষণ করা হচ্ছে? কেন পাকা বাড়িঘর বানানো হলো না? কেন স্বনির্ভর করে তোলা হলো না? কেন বনবাসী মানুষেরা চিকিৎসার সুব্যবস্থা পাবে না? কেন বনবাসীরা প্রতিমুহূর্তে বঞ্চনার শিকার হবে? আরও কত কাহিনি আছে যা হয়তো লিখে বা বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের চিন্তা করতে কেন পঞ্চাশটা বছর পার করতে হলো যে বনবাসী সমাজের ভাষা 'অলচিকি' কে স্বীকৃত করা যায়নি না আমরা ইচ্ছা করেই করিনি? এ নিয়ে ভাবনার দিন এসে গিয়েছে এবং আরও সুদৃঢ় ভাবে কী কী মাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনজাতি সমাজকে আরও ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যা সৃজনশীল দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হিসেবে আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারি। নতুন ধারার উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ আরও গভীরভাবে আলোকিত করতে পারে সে দিকে নজর রাখা রাষ্ট্রচালকের আশু কর্তব্য।

—**পার্থপ্রতিম দত্ত মজুমদার,**
দমদম, কলকাতা।

মাদার্স ডে—বর্তমান প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

অশোক কুমার মণ্ডল

চলমান জীবন প্রবাহে দেশ-জাতি তথা বিশ্বে এমন কতকগুলো তাৎপর্যবাহী দিন আসে যেগুলো আমাদের নব চেতনায় উজ্জীবিত করে, অনুপ্রাণিত করে নতুন অঙ্গীকারে। এই রকমই একটি বিশেষ দিন প্রতি বৎসরের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার ১৪ মে 'মাদার্স ডে' বা 'বিশ্বমাতৃত্ব দিবস।'

'মা' একটি শব্দ। প্রথম সুখানুভূতি 'মা'। প্রথম উচ্চারণ 'মা'। স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, সহনশীলতা, উদারতা, করুণা, বাৎসল্য অর্থাৎ 'মা' শব্দের তাৎপর্য ও ব্যাপকতা বিশাল, অপরিমেয়, অকল্পনীয়। মায়ের কোলেই পৃথিবীর আলো দেখা, মায়ের হাত ধরেই পথচলা, আদর যত্নে বড় হওয়া। জন্মদাত্রী মাকে শ্রদ্ধা-সম্মান-আদর যত্ন এবং দেশ জননীকে ভারতমাতা রূপে কল্পনা করা উন্নত কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও প্রাচীন ভাবনা। সৃজন শক্তির আধার স্বরূপ স্বয়ং ভগবান মাতৃরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই মাকে ভালোবাসে না এরকম সন্তান হয় কি?

অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস, যে দর্শন ও আদর্শের জন্য আমরা বিশ্ব-সভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছিলাম, সে দেশেই আজ 'বিশ্ব-মাতৃত্ব দিবস' উদযাপিত হচ্ছে— এ কেমন কথা! বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে মাকে নতুন বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করা, আত্মীয় পরিজন-বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে ভাল-মন্দ খাওয়ানো, উপহারে উপাচারে দিনটি উদযাপন, শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন ও কাছে বসে আনন্দ লাভে দু-চারটি কথা বলেই শেষ? এরপর মায়ের খোঁজ না করলেও চলবে? কী করছেন, কেমন আছেন জানার দরকার নেই? দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনকে মা ও সন্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া ভারতীয় রীতি বিরুদ্ধ। মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক আত্মিক, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। নাড়ীর সম্পর্ক। সেই কারণে অন্তিমকালে নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও নাভি কখনও পোড়ে না, ছাই হয় না। তবে কী 'মাদার্স ডে' হুজুগে বাঙালিপনা না পাগলামো?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবনীয় সাফল্য সত্ত্বেও বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের মননে ও চিন্তায় বেশ কিছু মাত্রাগত পরিবর্তন এসেছে। মানুষে-মানুষে স্নেহ-মমতা-ভালবাসার বন্ধন যে অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে— একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতিমাত্রায় ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তথা অভীষ্ট বস্তুটিকে পাবার জন্য মিথ্যা-কপটতা- নিষ্ঠুরতা অথবা হানাহানির সাহায্য নিতেও পিছপা হচ্ছি না। দেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের উল্লেখ ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে না থাকায় দেশের প্রতি দরদ কী তা ছাত্রসমাজ জানে না। নীতি-নৈতিকতা- আত্মমর্যাদা জ্ঞান নির্ভর সমাজ গঠনের শিক্ষা, স্কুল সিলেবাসে অদৃশ্য। শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান ইত্যাদি শব্দের অর্থ ভিন্ন তাৎপর্য বহন করছে। 'হোক কলরব' বা 'হোক চুম্বনের' মত বিকৃত রুচি ক্রমশ অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ছাত্র অন্যধায়ী, অসংযমী, উচ্ছৃঙ্খল, যুবসমাজ বিভ্রান্ত-দিশেহারা।

শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি-সংস্কৃতির মূল্য গুরুজনদের ভালবাসা শ্রদ্ধা-ভক্তি-সেবায়, তাদের আনন্দেই আত্মার শান্তি ও তৃপ্তি। এই বিষয়টিকেই অনেকাংশে আজকের প্রজন্ম গুরুত্ব দিতে চায় না। যে সকল মহাজীবন জীবন পথে চলার সঠিক পথ নির্দেশ দেন— সেই 'মাতৃত্বের' ত্যাগ তিতিক্ষা— অবদানের কথা জানতে চায় না, শুধু জানে নিজেকে। কেরিয়ারিস্ট। আত্মকেন্দ্রিক। চলচ্চিত্রের নায়ক-শিক্ষক- অধ্যাপক-ডাক্তার কে নেই এই দলে?

লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান সয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে স্থান হয় 'বৃদ্ধাশ্রমে'। কোনো কোনো বাবা-মা ভরণ-পোষণের দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। এরকম ঘটনা সংবাদপত্রের বহু শিরোনাম দখল করে। উজ্জ্বল ভারতের ছবির পরিবর্তে সামাজের মলিন ছবি দেখে কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি অমিতাভ লালা নজিরবিহীন রায়ে বলেছেন--- বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখভালের দায়িত্ব সন্তান পালন না করলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকী পারলৌকিক কাজও ছেলেকে করতে হবে— সামাজিকতা রক্ষায় নয়, মানবিক কারণে। এরূপ পরিস্থিতির প্রতি উদাসীন থাকা শুধু মানবতার বিরোধী নয়, বাংলা তথা ভারতকে বাঁচাবার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। মা-কে পরিত্যাগ করে মহর্ষি নারদ গৃহত্যাগী হয়ে তপস্যায় যাননি। শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করাচার্য মায়ের সম্মতি ক্রমেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বহুবার মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন— সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও। পুরাণের শ্রবণকুমার ও বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত কি আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে না? আমরা সকলে একত্রিত হয়ে এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সামাজিক বাঁধুনি ঠিক রাখার চেষ্টা যদি না করি তাহলে নীতিহীনতা-শ্রদ্ধাহীনতা ও চরম বিশৃঙ্খলায় ভরে যাবে দেশটা। বীর সাভারকর যেমন ইংরেজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সদম্ভে বলেছিলেন— 'দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী।' অনুরূপ অসহিষ্ণু, অশ্রদ্ধেয় মানুষজনের বিবেক- চৈতন্যের কাছে গুরুজনদের সঙ্গে কর্তব্য-অকর্তব্যের বার্তা দেওয়া যদি পাগলামো, হুজুগে বাঙালিপনা অথবা নারীবাদী আখ্যা পেতেও হয় তবে আমাদের সেজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(লেখক সাধারণ সম্পাদক, উলুবেড়িয়া বিশ্ব-মাতৃত্ব দিবস উদযাপন কমিটি)

পরম্পরা

গৌতম বুদ্ধের শেষ দিনগুলি

সন্দীপ চক্রবর্তী

সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। সন্ধ্যে নামতে তখনও দেরি আছে কিন্তু এরই মধ্যে মাঘ মাসের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় সারাদিনের প্রাণচঞ্চল প্রকৃতি কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে। অন্যদিন দিকচক্রবালে পাখিরা ওড়াওড়ি করে। আজ তারা কেউ নেই। এবার শীতটা কি অন্যবারের তুলনায় বেশি পড়ল?

তথাগত বুদ্ধর শিষ্য আনন্দ গিয়েছিলেন জল আনতে। তাঁর মন অতি বিষণ্ণ। গতকালই তথাগত এমন এক বাক্য উচ্চারণ করেছেন যা অমোঘ। অবশ্যম্ভাবী। আর মাত্র তিন মাস পর নাকি সকলের প্রিয় অমিতাভ বৌদ্ধসঙ্ঘ, সঙ্ঘের অগণন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরিত্যাগ করে পরিনির্বাণের পথে যাত্রা করবেন। আনন্দর বিশ্বাস হয় না। এও কি সম্ভব? পৃথিবী থাকবে, প্রকৃতি থাকবে, আকাশ-বাতাস-পশুপাখি, মানুষ— সব থাকবে শুধু অমিতাভ থাকবেন না! ভাবতে ভাবতে হঠাৎই অন্তর্লীন দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হলো আনন্দর মন। তিনি নিজের চোখে তথাগতর শরীরে ফুটে ওঠা জরার লক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। দিব্যপুরুষের চোখের যে জ্যোতিতে স্নাত হতো ত্রিরত্ন পৃথিবী, সেই জ্যোতি যেন ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে। কীসের যেন আকর্ষণে এক পুণ্যাত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে চাইছেন। আনন্দর মনে হলো অন্য সবকিছুকে তিনি অবিশ্বাস করতে পারেন কিন্তু নিজের চোখ আর অন্তরের উপলব্ধিকে কী করে অবিশ্বাস করবেন?

না, আনন্দ অবিশ্বাস করতে পারেননি। তার প্রয়োজনও হয়নি। কারণ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তথাগত বুদ্ধর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। বৈশাখের এক তাপ-জর্জরিত দিনে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ জাগতিক দিক থেকে সেদিন তথাগত বুদ্ধর জীবনাবসান হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আজও দিনটি সাড়ম্বরে পালন করেন। 'সাড়ম্বরে' কারণ দিনটি মোটেই তাদের কাছে কেবলমাত্র দুঃখের দিন নয়। এই দিন তথাগতর সাধনালব্ধ জীবনজ্যোতি তার প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বিশ্বপাণি লিখেছেন, পরিনির্বাণ কথাটির অর্থ পূর্ণাঙ্গ নির্বাণ বা অন্তিম নির্বাণ।

তার মানে কি এই, তথাগতর মৃত্যুসংবাদ শুনে বৌদ্ধ সঙ্ঘের কেউ দুঃখ বোধ করেনি? বিশেষ করে এই ঘটনা যেখানে বৌদ্ধসঙ্ঘের ইতিহাসে প্রায় ইন্দ্রপতনের সমান। তাছাড়া তথাগতর পরিনির্বাণ লাভ তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দর কথাও মনে করিয়ে দেয়। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তথাগত আনন্দর পরিচর্যা এবং সাহচর্যে কাটিয়েছেন। ধম্ম (ধর্ম) নিয়ে আনন্দর অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রীতি লাভ করেছেন তাঁকে নিয়ে আনন্দর হাজারো উদ্বেগে এবং তদুপরি বিস্ময়ে।

মহা পরিনির্বাণ সূত্ত অনুযায়ী, আশি বছর বয়েসে পা রাখার পর তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময়েই তিনি শীতের বিকেলে তিন মাস পর পরিনির্বাণ প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। সময়টা ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার। যুদ্ধের সম্ভাবনাও ছিল। এই সময় অশক্ত শরীরে তথাগত উত্তর ভারতে তাঁর সর্বশেষ পরিক্রমায় বের হন।

একদিন আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন তথাগত শিষ্যদের শেষ উপদেশ দিতে চান কিনা। জবাবে তথাগত স্মিত হেসে বললেন, 'আমি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছি আনন্দ। এটা আমার জীবনের আশিতম বছর। গাড়ি পুরনো হয়ে গেলে তাকে পিছন থেকে ঠেলতে হয়। আমার এই জীবনের গাড়িকেও, যতদিন না পুরোপুরি থেমে যায় ততদিন তোমাদের ঠেলতে হবে।' এই পর্যন্ত বলে তথাগত চুপ করে রইলেন। উপস্থিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা সকলে উৎকর্ণ। কী ভাবছেন তথাগত! জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি কী বলতে চান? তথাগত নীরবতা ভেঙে বললেন, 'ধর্মই মানুষের দীপ আনন্দ। ধর্মই আশ্রয়। তাই ধর্মে মতি স্থির রেখে নিজেই নিজের দীপ হয়ে ওঠো। —'আত্মদীপো ভব' আশ্রয় হও নিজের।'

জীবনের অনেক চড়াই-উতরাই আনন্দ পেরিয়েছেন। কিন্তু এমন আত্মবিক্ষোভের সম্মুখীন কখনও হননি। তথাগতর ওই উদাসীনতার জন্য যেন তিনিই দায়ী। একদিন তো বলেই ফেললেন, 'আপনি থাকুন প্রভু। পৃথিবী যতদিন সূর্যের চারপাশে ঘুরছে ততদিন আপনি থেকে যান।' তথাগত রাজি হলেন না। এর আগে তিনি বেশ কয়েকবার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বৌদ্ধসঙ্ঘ যদি চায়, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ যদি চায় তাহলে তিনি থেকে যাবেন। কিন্তু তখন আনন্দরা কেউ উচ্চবাচ্য করেননি। এখন অনেক দেরি হয়ে

গেছে।

তথাগত বললেন, 'আনন্দ, আমি কি তোমাদের প্রথম দিন থেকে এটাই শেখাইনি, মানুষের যা কিছু প্রিয় একদিন তার থেকে মানুষকে দূরে সরে যেতে হয়? পৃথিবীতে যা কিছু জন্মায়, বড়ো হয়— তারা আসলে সরল থেকে জটিল হয়ে ওঠে। তাই তাদের লয় অনিবার্য। তাছাড়া আনন্দ, যে কথা বলার জন্য তথাগতর এই পৃথিবীতে আসা তা তো বলা হয়েই গেছে। এখন বাকি শুধু অন্তিম নির্বাণ।'

আত্মমুক্তির জন্য কী করণীয় তার সবই তথাগত শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই শেষ পরিক্রমায় কোনোও নতুন উপদেশ নয়, পুরনোগুলিই মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তথাগত। দৈনন্দিন জীবনের অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তাঁর শিক্ষা পিতার স্নেহে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন গ্রাম-নগরের মানুষজনকে। তাঁকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনারও যেন শেষ নেই। তথাগত এসেছেন শুনলেই হলো, দলে দলে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর পথের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। সদ্য হাঁটতে শেখা শিশু তাঁর বস্ত্রাঞ্চল মুঠোয় ধরে তাঁকে পিছু ডাকে। এসব দেখে আনন্দ ভাবেন আশ্চর্য এই দেশ! এ দেশের মানুষ। এত প্রেম এত সমর্পণ পিছনে ফেলে তথাগত কীভাবে পরিনির্বাণে যাবেন?

পরপর কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টিতে আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তথাগতর কোনো তাড়া নেই। অশক্ত শরীরেও প্রতিদিন কয়েক মাইল হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। জীবনের যে যাত্রাপথ তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন। আন্তরিক প্রচেষ্টার যে কোনো বিকল্প নেই তার সানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। এইভাবে তিন মাস কেটে গেল। মহাপরিনির্বাণ সুত্ত অনুযায়ী, এই সময় একদিন তথাগত পাবা নামক একটি জায়গায় পৌঁছলেন। আশ্রয় নিলেন কুণ্ডা নামের এক লোহারের আমবাগানে। সঙ্গে অনেক শিষ্য। কুণ্ডা তথাগতকে তাঁর বাড়িতে অন্নগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

পরের দিনই তথাগত কুণ্ডার বাড়িতে গেলেন। যুগন্ধর সন্ন্যাসীর জন্য কুণ্ডা সযত্নে শূকরা-মড্ডরা তৈরি করেছিলেন। বস্তুত এটাই ছিল সেদিনের বিশেষপদ। তথাগত বললেন শূকরা-মড্ডরা তিনি একাই খাবেন। সঙ্ঘের ভিক্ষুদের যেন এই পদ না দেওয়া হয়। এমনকী তাঁর পাত্রে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট যেটুকু পড়েছিল তাও ফেলে দিতে বললেন।

ঘটনাটা নিঃসন্দেহে অবাক করে দেবার মতো। পরবর্তীকালে কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জনপ্রিয় ব্যাখ্যাটি হলো, শূকরা মড্ডরার অর্থ সেদ্ধ করা শূকরের মাংস। তৎকালীন লোহার-সমাজে যা খুবই প্রচলিত ছিল। অথচ অহিংসার পূজারি তথাগতর পক্ষে প্রাণীমাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা এক কথায় অসম্ভব। আবার কুণ্ডার পরিবেশিত খাদ্য প্রত্যাখ্যান করলে তাতে প্রেমধর্মের হানি ঘটে। সেইজন্যই তথাগত নিজে খেয়েছিলেন কিন্তু ভিক্ষুদের খেতে দেননি। বলা হয়, শূকারা-মড্ডরা খাওয়ার কিছু পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভবত তাঁর আন্ত্রিক বা আমাশয় জাতীয় কোনো অসুখ করেছিল। এই অসুখই তাকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। যাই হোক, এসব পরের কথা। আগে দেখা যাক তথাগত কী বলেছিলেন।

ক্ষুব্ধ আনন্দকে শান্ত করে তথাগত বললেন, 'তোমরা যেন কুণ্ডাকে দোষ দিয়ো না। সে অন্যায় কিছু করেনি। আজ যা হলো তা তার অনেক জন্মের সাধনার ফল। আমাকে খাদ্য পরিবেশন করে সে মুক্ত হলো।'

ভিক্ষু-পরিবেষ্টিত হয়ে তথাগত কুশিনারার (অধুন কুশিনগর) শালবনে প্রবেশ করলেন। আনন্দকে শয্যা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। যে শয্যাটি থাকবে দুটি শালগাছের মধ্যবর্তী স্থানে। মাথার দিকটি থাকবে উত্তরদিকে। শয্যা প্রস্তুত হলে তথাগত ডান পাশ ফিরে শয়ন করলেন। একটি পা রইল অন্যটির ওপর। ডান হাতে ধরা রইল মাথা। যাঁরা অজন্তায় গেছেন তাঁরা তথাগতর এই রূপ দেখেছেন।

এরপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সরাসরি মহা পরিনির্বাণ থেকে তুলে দিচ্ছি--- '...তথাগত শয়ন করা মাত্র শালগাছ দুটি ফুলে-ফুলে ভরে গেল। শালগাছের ফুল ফোটার সময় সেটা নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও একরাশ শালফুল যেন তথাগতর পায়ে সমর্পিত হবার কামনায় বৃষ্টির মতো নেমে এল। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল চন্দনের গন্ধ। শোনা যাচ্ছিল স্বর্গীয় মন্ত্রোচ্চারণ। পরিবেশ-প্রতিবেশের সকলেই যেন এক মহাপথিকের যাত্রাশেষের মুহূর্তে তাঁর বন্দনায় উপস্থিত হয়েছেন।'

শয্যাগ্রহণের সময় তথাগতর পরনে ছিল সোনালি রঙের পোশাক। আনন্দ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন পোশাকের উজ্জ্বল সোনালি রঙকে ছাপিয়ে উঠেছে তথাগতর গাত্রবর্ণ। জীবনে দু'বার তথাগতর গাত্রবর্ণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রথমবার বোধিবৃক্ষতলে নির্বাণ লাভের সময় আর দ্বিতীয়বার পরিনির্বাণের সময়। কী ঘটতে চলেছে আনন্দর বুঝতে অসুবিধে হলো না। তিনি ডুকরে উঠলেন, 'আমার শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি প্রভু! আপনি চলে গেলে কে আমাকে শেখাবে?' তথাগত সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'কেঁদো না আনন্দ। জন্ম আর মৃত্যু একে অন্যের পরিপূরক। জন্ম থাকলেই মৃত্যু থাকবে।' শালবনের থমথমে নীরবতায় হারিয়ে গেল কয়েকটা না-বলা কথা। তথাগত প্রিয় শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'দয়া এবং প্রেমধর্মের প্রতিটি অধ্যায় তুমি অনুশীলন করেছে আনন্দ। সেই হিসেবে তুমিও একজন পুণ্যাত্মা। অল্পদিনের মধ্যে তুমিও জ্যোতিষ্কস্বরূপ হয়ে উঠবে।'

তথাগতকে শেষদেখা দেখার জন্য কুশিনগরের আবাল-বৃদ্ধ- বণিতা চাকভাঙা মৌমাছির মতো ছুটে আসত। কোথায় তথাগত! কী হয়েছে তাঁর! এমন চিকিৎসক কি কেউ নেই যিনি তথাগতকে সুস্থ করে তুলতে পারেন? হাজারো প্রশ্ন তাদের। তথাগত যথাসম্ভব উত্তর দেন। একদিন সুভদ নামের এক যোগীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা

দিলেন। সেই তাঁর শেষ দীক্ষাদান।

দিন শেষ হয়ে আসছিল। একদিন এক সেবককে ডেকে তাঁর শয্যাটি ভিড় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে বললেন তথাগত। চাঁদনি রাত। আকাশে অজস্র তারা। তথাগত দূরে তাকিয়ে রইলেন। দশটি দিকের দেবতারা এসেছেন তাঁকে দেখতে। ভিড়ের জন্য তাঁরা ভালো দেখতে পাচ্ছেন না। তাই এই দূরে সরে যাওয়া।

দেবতারা চলে যাবার পর তথাগত আনন্দকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কারও কারও মনে হতে পারে আমি যখন থাকব না তখন তোমাদের কোনো অবলম্বন থাকবে না। কিন্তু ভাবনাটা ভুল। এতদিন আমি তোমাদের যা শিখিয়েছি, সে ধর্মই হোক বা অনুশাসন— আমি যখন থাকব না সেটাই হবে তোমাদের অবলম্বন। আমি আমার সৃষ্টির মধ্যেই লীন হয়ে যাব। সমগ্রে মিশে যাবে আমার খণ্ডসত্তা।'

এরপর তথাগত উপস্থিত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ধর্ম এবং সঙ্ঘ সম্বন্ধে তাঁদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কেউ উত্তর দিলেন না। তথাগত বললেন, 'শোনো ভিক্ষুরা, আমি তোমাদের বলছি সমস্ত যৌগিক জিনিসের ক্ষয় আছে। মৃত্যু আছে। কথাটা মনে রাখবে।'

এটাই ছিল তথাগতর শেষ উপদেশ। এরপর তিনি সমাধিস্থ হন। এক অনির্বাণ জ্যোতি তার মৃত্যুপাণ্ডুর শরীর ত্যাগ করে দিগন্তে হারিয়ে যায়। মহাপরিনির্বাণ সূত্ত অনুযায়ী, তথাগতর মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির রোষ উপেক্ষা করে বড়ো হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের বিয়োগব্যথা। আত্মজনকে হারিয়ে ফেলার শোক। ২৫০০ বছর পর এই একবিংশ শতকেও ফেব্রুয়ারির একটি নির্দিষ্ট দিনে ভারতবর্ষ উপস্থিত হয় কুশিনগরে। থাকেন হিন্দু বৌদ্ধ দুই ধর্মেরই মানুষ। তাঁরা প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসান আর মন্ত্রোচ্চারণ করেন, ওম মুনি মুনি, মহামুনি, শাক্যমুনি— স্বাহা!'

(বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত)

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক ভক্তকবি গিরিশচন্দ্র

রূপশ্রী দত্ত

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে গায়ক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন। বাংলা নাট্যজগতের সুবর্ণযুগে তাঁর ভূমিকা অনেকখানি। তাঁকে 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক' বলা হয়। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বহু অভিনেতা অভিনেত্রীর শিক্ষাদাতাও ছিলেন। ১৮৭২ সালে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক আর এক বিশিষ্ট অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। তাঁরা দুজনে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' মঞ্চায়িত করেন।

তাঁর স্বরচিত নাটক ৪০টি। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতেন আর এক ব্যক্তি শ্রুতিলিখন করতেন। তিনি এক রাত্রেই লিখে ফেলেন— 'সীতার বনবাস'। ছয় অঙ্কের নাটক 'বিল্বমঙ্গল' লিখেছিলেন ২৮ ঘণ্টায়। তাঁর লিখিত 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। সেখানে অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীকে তিনি বলেছিলেন— 'তোমার চৈতন্য হোক'। ১৮৮৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এই অভিনয় হয়।

ব্যক্তিজীবনে গিরিশচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত দুঃখী। দুই স্ত্রীবিয়োগ, দুই কন্যাবিয়োগের শোক তাঁকে পেতে হয়েছিল। এছাড়া তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের মৃত্যু ঘটেছিল তিন বছর বয়সে। সারাদিন অফিস করার পর রঙ্গালয়ে নাটক অভিনয় করতেন। নাটক লিখতেন রাত্রি তিনটে চারটে পর্যন্ত। গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রতিবেশী কালীনাথ বসুর পৈতৃক বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দেখেন। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁরা পরস্পরকে সম্মান করতেন। গিরিশচন্দ্রের রচিত 'বুদ্ধচরিত' বিবেকানন্দের বিশেষ প্রিয় ছিল। বিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রকে 'জিসি' বলে ডাকতেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় বলরাম বসুর বাড়িতে। তিনি স্বামীজীর মানবপ্রেমকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতেন।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ তিথিপূজার দিন বিবেকানন্দ স্বহস্তে গিরিশচন্দ্রকে শিবানুচর ভৈরবের সাজে সাজিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ওই রূপই দেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র, বাড়িতে দুর্গাপূজা করতেন। সেই পূজায় মা-সারদাও উপস্থিত থাকতেন।

গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে জনচিত্তগ্রাহী এক চলচ্চিত্রও মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৬ সালে। গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল। 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' ছবিতে বিনোদিনীর ভূমিকায় ছিলেন সন্ধ্যারানি। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অনিল বাগচী। সন্ধ্যারানির লিপ-এ গীতা দত্তের গাওয়া গানগুলি অনবদ্য। ভক্তকবি গিরিশচন্দ্রের নাম পরিব্যাপ্ত রয়েছে বাংলার সংস্কৃতি জগতে।

অন্নের অপচয় বন্ধ করতে পারেন মহিলারা

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

খাবার নষ্ট করা উচিত নয়— ছোটবেলা থেকেই একথা আমরা শুনে আসছি। অথচ তা সত্ত্বেও আমরা প্রায়ই খাবার ফেলে দিই বা নষ্ট করে থাকি। খাবারের প্রতি আমাদের এই ধরনের মানসিকতার জন্য আজ খাদ্যসঙ্কট সমগ্র বিশ্বে একটি ঘোরতর সমস্যার রূপ নিয়েছে। আমরা মা-লক্ষ্মীর হাতে ধান দেখি, মা-অন্নপূর্ণাকে দেখি অন্ন বিলোতে— এই ভাবে প্রাচীনকাল থেকেই অন্নকে ভগবানের দেওয়া প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ রূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। খাবারকে প্রণাম করে তারপর তা গ্রহণ করার মতো ভালো প্রথা এই যুগেও অনেকে মেনে চলেন। এই সংস্কারের জন্য তাঁরা ভগবানের প্রত্যক্ষ দান খাবার নষ্ট হতে দেন না। তাই খাদ্যান্নের বিন্দুমাত্র অপচয় হয় না। কিন্তু, যখন আমরা পাশ্চাত্য ভোগবাদী মানসিকতায় বশীভূত হয়ে খাবার খাই, তখন এই ভাব থাকে না। অনেক সম্পন্ন ঘরে খাবার অপচয় করা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খাবার নষ্ট করা মানেই আর্থিক এবং পরিবেশ উভয়েরই যে ক্ষতিসাধন হয়— তা বিশেষজ্ঞরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে চলেছেন। প্রতি বছর আমরা ৬.৭ কোটি খাদ্যান্ন নষ্ট করে থাকি। এই পরিমাণ খাবার ব্রিটেন সারা বছরে উৎপাদন করতে পারে না এবং তা দিয়ে বিহারের মতো বড় রাজ্যের সারা বছরের খাদ্যান্নের প্রয়োজন মিটতে পারে। অপচয় করা ওই পরিমাণ খাবারের দাম ৯২ হাজার কোটি টাকা। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মন কি বাত'-এ অন্নের অপব্যবহার না করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের দেশের অনেক গরিব মানুষের দু'বেলার খাবার জোটে না। তা সত্ত্বেও বাড়ি, বিয়ে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণ খাবার আমরা নষ্ট করে থাকি। যেসব খাবার নষ্ট করি, সেগুলি তৈরি করতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়। ১ কিলোগ্রাম গম নষ্ট হওয়ার মানে ১৫০০ লিটার জল নষ্ট হওয়া, ১ কিলোগ্রাম চাল নষ্ট হওয়া মানে ৩৫০০ লিটার জল নষ্ট করা। এছাড়া খাবার তৈরির জন্য কৃষিযোগ্য জমি, গ্রিনহাউস গ্যাসে সৃষ্টি, প্রচুর মাত্রায় তেল কাজের জন্য কৃষিযোগ্য মেশিন চালাতে ব্যয় হয়। একদিকে বিপুল জনসংখ্যার চাপ, অপরদিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমি। সেজন্য বর্তমান বা ভবিষ্যতে খাবারের অপচয় বন্ধ করতে পারলে খাদ্যসমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব। ছোট কৃষকদের সুবিধার জন্য গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট কোল্ড স্টোরেজ এবং গ্রামগুলির আশেপাশে মেগা ফুডপার্ক তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় যেসব জিনিস তাড়াতাড়ি খারাপ হয় যেমন ফল-সবজি সময়মতো প্যাকেজিংয়ের সুবিধা হবে। অপুষ্টির শিকার প্রায় ২০ কোটি ভারতীয়দের পেট ভরে খাওয়ানোর জন্য সামাজিক সংস্থাগুলিকে ফুডব্যাঙ্কের সাহায্য নিতে হবে। অনেক সামাজিক সংস্থা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে রোটি ব্যাঙ্ক, রবিনহুড আর্মি, পৃথ্বী ইনোভেশন, নো ফুড ওয়েস্ট, ফিডিং ইন্ডিয়া, মীল্স পালীন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অন্নের অপচয় বন্ধ করায় মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যতটা প্রয়োজন, ততটাই যদি কেনাকাটা করি, তাহলে খাবার এবং অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হয়। ফ্রিজে অনেকসময় একদিন আগের রান্না করা খাবার রাখা থাকে, পরের দিন খাবার পরিবেশনের সময় সেই পুরনো খাবার সবার আগে খেয়ে নেওয়া ভাল। বেশি সবজি কেনা হলে, সেগুলি ভালভাবে গুছিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে নষ্ট হবে না, সময়মতো বের করে রান্না করে খাওয়া যাবে। অনেক সময় একটু একটু বেঁচে যাওয়া খাবার একসঙ্গে মিশিয়ে গরম করে নতুন স্বাদের একটা তরকারি তৈরি হয়ে যায়। মরশুমি ফল-সবজি খাওয়া ভাল এবং সেগুলি চট করে খারাপও হয় না। অনেকে আছেন যাঁরা সবজির সব অংশ দিয়েই সুস্বাদু রান্না করতে জানেন। যেমন খোসার চচ্চড়ি, ডাটা-চচ্চড়ি, খোসা ভাজা ইত্যাদি। নানা সবজির সঙ্গে শাক (কপি, মুলো, বীট) ইত্যাদি দিয়ে রকমারি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাবারও তাঁরা বানিয়ে থাকেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় কিছু খাবার নষ্ট করার পরিবর্তে সেগুলি কুকুর, পাখির খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা শ্রেয়। এছাড়া বেঁচে যাওয়া কিছু তরকারি, খোসা ইত্যাদি মাটিতে পুঁতে দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়, যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। এইভাবে মহিলারাই খাবার নষ্ট না করার নানারকম উপায় দেখতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী একটি উপদেশ আমাদের সবার জন্য গ্রহণযোগ্য, তা হলো, খাবার সময় পেট এবং প্লেট দু'টিই একটু খালি রাখুন। মায়েরাই পারেন ছোটদের ছোটবেলা থেকে এর অভ্যাস করাতে।

ক্যামেরা ড্রোন তৈরির প্রথম বাঙালি কারিগর গাজোলের হরিচরণ

জয়দেব সাহা ॥ বাঙালি সমাজে প্রতিভার আকাল কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাঙালি তার প্রতিভা বিকাশের চিরকালীন ক্ষেত্র ছেড়ে যেভাবে বিচিত্রগামী হয়েছে তা কি আগে কখনও হয়েছে? বাঙালি কিশোর মেসি-বিরাট কোহালির জন্য গলা না ফাটিয়ে, রণবীর-দীপিকার সিনেমা না দেখে ড্রোন তৈরি করছে, সেই ড্রোন ৮০০ মিটার উঁচুতে উঠে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলতে পারে— অদূর বা সুদূর অতীতে এরকম হয়েছে বলে মনে হয় না।

অথচ এই নিদারুণ কঠিন কাজটা প্রায় অবলীলায় করে ফেলেছে হরিচরণ। হরিচরণ সরকার। দেখলে মনে হবে সে এতটাই লাজুক যে নিজের নামটাও বোধহয় ঠিক করে বলতে পারবে না। এত আস্তে কথা বলে, মাইকেও স্পষ্ট শোনা যায় না। কিন্তু রিমোটের সাহায্যে ড্রোন উড়িয়ে দেখানোর সময় তার চোখদুটো ঝকঝক করে। গ্রামের ছেলের কিছু করে দেখানোর প্রতিজ্ঞা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। তার প্রমাণ যুগে যুগে পেয়েছে ভারতবর্ষ।

ড্রোন হাতে হরিচরণ

হরিচরণের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে যেতে হবে মালদহ। সেখানে গাজোল মহকুমার সালাইডাঙা অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রাম ইদামের এক কৃষক পরিবারের একমাত্র সন্তান হরিচরণ। বাবা হারাধন সরকার। মা ছায়া সরকার গৃহবধূ। পড়ে একাদশ শ্রেণীতে। গাজোল হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে। থাকে গাজোলের কদুবাড়ি ছাত্রাবাসে। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানমনস্ক হরিচরণ অনেকদিন ধরেই উড়তে পারে এমন কিছু তৈরি করার কথা ভাবছিল। একদিন ইন্টারনেটে ড্রোনের ছবি দেখে সে ড্রোন বানানোর কথা ভাবতে শুরু করে। যে ড্রোন সম্পূর্ণ তার নিজের ভাবনায় তৈরি হবে। কিন্তু রাস্তা পেলেই তো আর হলো না, লক্ষ্যে পৌঁছতে টাকা লাগবে। কে দেবে টাকা? অনেক ভাবনাচিন্তা করার পর একটা উপায় পাওয়া গেল। হরিচরণ বারো হাজার টাকা বাবার কাছ থেকে ধার করল। সেই টাকায় কেনা হলো ৪টি মোটর, প্রপেলর, ৪টি স্পিড কন্ট্রোলার, ব্যাটারি, ফ্লাইট কন্ট্রোলার বোর্ড, রিসিভার— এমনকী একটা ৫ মেগাপিক্সল ক্যামেরাও। অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে তৈরি হলো মূল কাঠামো। তারপর মাসখানেকের লাগাতার পরিশ্রম। হরিচরণের সহপাঠীরা জানিয়েছে, সে নিজের খেয়ালেই কাজ করত। কী তৈরি করছে সেই বিষয়ে কাউকে কিছু বলত না। বরাবরই সে কম কথা বলে। যেদিন প্রথম সে তার ড্রোন উড়িয়ে দেখাল সেদিন তো বন্ধুরা থ। ইদামের কেউ এর আগে ড্রোনের নামই শোনেনি। অথচ তাদেরই একজন বানিয়ে ফেলল। অবাক না হয়ে যায় কোথায়! বন্ধুরা ভালোবেসে তার নাম দিয়েছে পাগলবিজ্ঞানী।

হরিচরণের অবশ্য বক্তব্য, তার এই ড্রোন ততটা শক্তিশালী নয়। আরও ৪০-৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে সে আরও উন্নতমানের ড্রোন তৈরি করতে পারে। বাজারে এখন যার দাম দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। গাজল হাইস্কুলের শিক্ষকেরা তার পাশে আছেন। ছাত্রগর্বে গর্বিত প্রধানশিক্ষক ননীগোপাল বর্মণ ভবিষ্যতে হরিচরণকে সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কতটাই বা সাহায্য করতে পারেন! হরিচরণের এখন সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। একমাত্র সরকারই পারে হরিচরণের মতো কিশোর প্রতিভাকে তার যথার্থ গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। ▌

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা
'থাকে যদি ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা'
TURMERIC POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA TURMERIC POWDER
DUTA CUMIN POWDER
DUTA Curry Powder
DUTA RED CHILLI POWDER
DUTA CORIANDER POWDER
Pure Indian Spices
fssai
Lic. No.
12812019005087
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

তিন মেরু জয়ই লক্ষ্য টুসির

মাউন্ট এভারেস্টে পা রেখেছেন আবার আন্দামান সাগরের তলদেশও ছুঁয়ে এসেছেন। এক কথায় পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের তলা সবই এই মহিলার করায়ত্ত হয়েছে অনায়াসলব্ধ দক্ষতায়। দমদম পার্কের টুসি দাস গড়পড়তা বঙ্গললনাদের কাছে জীবন চর্চার প্রেরণাস্বরূপ। স্বস্তিকার প্রতিনিধি জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনে উঠে এল তার জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিফলন।

❑ এভারেস্ট জয়ের অনুভূতি কী রকম?

❑ কিংবদন্তি জর্জ ম্যালোরির ওই অমোঘ উক্তি 'বিকজ এভারেস্ট ইজ দেয়ার' এই প্রবাদবাক্যের অমোঘ আকর্ষণে বিশ্বের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করার অভিলাষ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দমদম পার্ক তরুণ দলের অভিযাত্রী হিসেবে এভারেস্ট জয় 'ভিনি-ভিডি-ভিসি' বলা চলে। উত্তর কাশ্মীর নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে অ্যাডভানসড কোর্স করে এভারেস্ট অভিযানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আমি যে বছর এভারেস্ট জয় করি, সেবার আরও তিন বাঙালি পর্বতারোহী ওই শৃঙ্গ জয় করেছে। এভারেস্ট শীর্ষে ওঠার পর চূড়োর ঢালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি রেখে আসি আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আমি যেন কিংবদন্তী সত্যব্রত দাশের মতো তিন মেরু জয় করে অনন্যসাধারণ কীর্তি স্থাপন করতে পারি।

❑ এভারেস্ট অভিযানে বিভিন্ন তরফে কী ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন?

❑ রাজ্য সরকার ও স্থানীয় বিধায়ক সমস্তরকম ভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া স্টেটব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ পুরস্কারবাবদ দিয়েছে। আমার কাকু গ্রুপ ক্যাপটেন সমরজিৎ ধর, আমার মা, দাদা, দিদি মানসিক বল জুগিয়েছেন। প্রথম মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাঙালি দেবাশিস বিশ্বাস আমার পাড়া থেকে খুব বেশি দূরে থাকেন না। তিনিও নানা সময়ে উদ্দীপক কথাবার্তা বলে জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

টুসি দাসের মা সবিতা দাস।

❑ এভারেস্ট জয়ের পর এবার কী লক্ষ্য?

❑ এভারেস্ট জয়ের আগেই আন্দামানে হ্যাভলক দ্বীপপুঞ্জে স্কুবা ডাইভিং করে অতল জলের তলদেশ অভিযান করে এসেছি। তারপর বিশ্বের প্রথম মহিলা হিসেবে গাড়োয়ালের থলাই সাগর শৃঙ্গ অভিযান করি সাফল্যের সঙ্গে। সুইস আলপাইন মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সও আমি করেছি সাফল্যের সঙ্গে। তাই এর পরের লক্ষ্য আলপাইন (সুইজারল্যান্ড) পর্বতমালা জয় করা। সবশেষ লক্ষ্য বিশ্বের সব মহাদেশের শীর্ষ শৃঙ্গগুলি জয় করা আর সম্ভব হলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু।

❑ ভবিষ্যতের অভিযাত্রীদের প্রতি কী বার্তা?

❑ আমি বাগুইহাটির ডিরোজিও কলেজে পড়ার সময় থেকেই বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখতাম। বান্ধবীদের বলতাম ঘরকন্না করে জীবনটা শেষ করে দিস না। বিদ্যাসাগরের ভাষায় 'চল কিছু করে দেখাই' এই মন্ত্র পাথেয় করে জীবনকে জগতের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলেই মনুষ্য জন্মগ্রহণ স্বার্থক। আমি সেভাবেই এগিয়ে চলেছি। আর আমার দেখাদেখি পাড়ার কিছু মেয়ে রক ক্লাইম্বিং কোর্সে ভর্তি হয়ে পাশ করে নানারকম অভিযানে বের হচ্ছে। আমি তিন মেরু জয়ী বাঙালি সত্যব্রত দাশের অ্যাকাদেমিতে বিশেষ ট্রেনিং নেব যাতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু জয় করতে পারি একবারে। বিবাহসূত্রে দিল্লিতে থাকি। মাঝেমধ্যে কলকাতায় বাপের বাড়িতেও আসি।

সর্বত্র সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের বাচেন্দ্রি পাল, মেরিকম, প্রেমলতা আগরওয়ালদের গল্প বলে তাদের মনে মহাজাগতিক কল্পনার স্তরটাকে গড়ে পিটে দিই ভবিষ্যতে বড় কিছু করতে। ■

পুরাতনী

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র

প্রতিদিন সকালবেলা উঠে আমরা যে সংবাদপত্র হাতে পাই তা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুশো তিরিশ বছর আগে। একজন বিদেশির হাত ধরে। আমাদের দেশে আগে কাগজে লেখা সংবাদপত্রের ধারণা ছিল না। মানুষ ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখতো চিঠিপত্রের মাধ্যমে। রাজ্যবাসীর প্রতি রাজার কোনো ঘোষণা থাকলে তা ঢাক পিটিয়ে করা হোত। গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে ঢাক পিটিয়ে মানুষ জমা করে চিৎকার করে বলা হোত— শুনুন শুনুন সবাই।

তারপর একদিন ইংরেজদের জাহাজে কলকাতায় এলেন এক বিদেশি। নাম জেমস্ অগাস্টাস হিকি। এই হিকি ইংল্যান্ডে কোনো কাজ পাচ্ছিলেন না, তাই তিনি কাজের খোঁজে আসেন

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertifer.

আমাদের দেশে। কলকাতায় এসে তিনি শুরু করলেন সংবাদপত্রের ব্যবসা। ১৭৮০ সালে চালু করলেন একটি সংবাদপত্র। নাম বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার। সংক্ষেপে বেঙ্গল গেজেট। এটিই ভারতের প্রথম সংবাদপত্র।

তখনকার দিনে প্রযুক্তি এত উন্নত ছিল না। ছাপাখানায় কাঠের অক্ষর বানিয়ে লেখা ছাপা হোত। কালির লেখা ধেবড়ে যেত। বেঙ্গল গেজেটও সেইভাবেই ছাপা হোত। কাগজটি লম্বায় ছিল বারো ইঞ্চি ও চওড়ায় আট ইঞ্চি। দেখতে খুব সুন্দর ছিল না। সপ্তাহে একটি করে প্রকাশিত হোত। বিক্রি হোত কেবল কলকাতার ইংরেজ পরিবারগুলির কাছে। ইরেজিতে হওয়ায় বাঙালিরা এই কাগজ পড়ত না। তখন কলকাতায় হাতে গোনা কয়েকজনমাত্র ইংরেজি ভাষা জানতো।

বেঙ্গল গেজেটে প্রকাশিত খবরগুলি ছিল মূলত ইংরেজ জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত। যেমন— কোনদিন কোন জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসছে। জাহাজে কী কী মালপত্র আসছে ইত্যাদি। এছাড়া থাকতো ইংল্যান্ডের পুরোনো কিছু খবর। আর বাকি জায়গা জুড়ে থাকতো বিজ্ঞাপন। পরে হিকি তাঁর সংবাদপত্রে আরো একটি বিষয় যোগ করেন, সেটি হলো পোয়েটস্ কর্নার। এই পোয়েটস্ কর্নারে কবিতা প্রকাশিত হোত। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল পোয়েটস্ কর্নার। সংবাদপত্র পড়ে পাঠক তার মতামত জানতে পারতো। সেজন্য হিকি তার বাড়ির সামনে একটি বাক্স বসিয়েছিলেন।

কিন্তু এই সংবাদপত্র বেশিদিন চলেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রোষানলে পড়ে তা বন্ধ হয়ে যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন সেই সময়ের ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর। হিকির বেঙ্গল গেজেটে প্রকাশিত হয় হেস্টিংসের নানা কুকীর্তির কথা। এতে হেস্টিংস খুব ক্ষুব্ধ হন। ক্ষমতাবলে তিনি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সংবাদপত্র বিলি বন্ধ করে দেন। কিন্তু হিকি তাতে দমে না গিয়ে নিজে পাঠকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেঙ্গল গেজেট পৌঁছে দিতে থাকেন। হেস্টিংস তখন হিকির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার রায়ে হিকির জেল ও জরিমানা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর ছাপাখানা। জেল থেকে যখন ছাড়া পান তখন তিনি একেবারে নিঃস্ব। এরপর তিনি আর বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত করতে পারেননি। এইভাবে বন্ধ হয়ে যায় ভারতের প্রথম সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেলে হিকি আবার ভাগ্যের সন্ধানে জাহাজে চীনদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি চীন দেশে পৌঁছোতে পারেননি। শোনা যায়, জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ত্রিদিব সোম

ভারতের পথে পথে

রায়গড় দুর্গ

ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে যে মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার কেন্দ্র ছিল রায়গড়। শিবাজী বিজাপুরের সুলতানের হাত থেকে রায়রি দুর্গ ছিনিয়ে নেন এবং তা পুনর্নির্মাণ করে নাম দেন রায়গড়। এই রায়গড় দুর্গেই শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত গাগাভট্টের পৌরহিত্যে সম্পন্ন হয় এই রাজ্যাভিষেক। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব রায়গড় দুর্গ দখল করেন এবং নাম দেন ইসলামগড়। এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন চন্দ্ররাও নামে কোনো শাসক। তারপর বিভিন্ন সময় তা বিভিন্ন শাসকের অধীনে আসে। কিন্তু রায়গড় খ্যাত হয়ে আছে শিবাজীর মারাঠা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হিসেবেই। তার আমলেই রায়গড় মারাঠা শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে।

এসো সংস্কৃত শিখি

কথং বিস্মরণং ভবতি?

কেমন করে ভুলব?

ভবতঃ সঙ্কেতম্ এব জানামি স্ম।

তোমার ঠিকানাই জানা ছিল না।

মহাপুরুষঃ সংবৃতঃ ভবান্।

তুমি তো মহান ব্যক্তি হয়ে গেছ।

ভবান্ এব কিম্? দূরতঃ ন জ্ঞাতম্।

আরে তুমি? দূর থেকে চিনতেই পারিনি।

হ্যঃ ভবন্তং স্মৃতবান্।

গতকাল তোমার কথাই ভাবছিলাম।

ভালো কথা

জল নষ্ট, জল কষ্ট

সুজয় সুস্মিতা দুই বন্ধু। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখলো ওদেরই বয়সি দু'জন ছেলেমেয়ে রাস্তার কলে জল খাচ্ছে। কিন্তু কল থেকে যত জল উঠছে তার বেশির ভাগটাই নষ্ট হচ্ছে। পরের দিন ওরা দু'জন একটা বালতি এনে মেপে দেখলো জনপ্রতি কত পরিমাণ জল নষ্ট হচ্ছে। তারপর সেই জল নিয়ে গিয়ে তারা স্কুলের বড়দিদিকে দেখালো। বড়দিদি তখন সবাইকে ডেকে বললেন, কেউ যেন জল খাওয়ার সময় রাস্তায় বা বাড়িতে জল নষ্ট না করে ও জলের কল খুলে না রাখে। রাস্তায় জলের কল খোলা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ, জলই হলো জীবন। এইভাবে যদি জল নষ্ট হতে থাকে তাহলে একদিন জলের হাহাকার দেখা দেবে। এরপর থেকে যারা জল নষ্ট করেছে বড়দিদি তাদের ডেকে আবার বুঝিয়েছেন।

রূপসা দেবনাথ, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা-৪৯

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

প্রাক্তনী

অনিরুদ্ধ চন্দ, একাদশ শ্রেণী

কত স্মৃতি কত কথা
মনের কোণে জমে ব্যথা
ফেলে আসা ছোট্টবেলা
ক্লাসরুম আর পড়াশুনা

প্রিয়বন্ধু খেলাধূলা
টিফিন নিয়ে কত মজা
কিছুই আজও ভুলিনি
আমরা এখন প্রাক্তনী।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শব্দরূপ-৮৩২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ছল, ছুতা, মিথ্যা অজুহাত, **৩.** প্রেতোদ্দিষ্ট-দান গ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ, **৪.** সম্ভ্রম, সম্মান, **৫.** '— রে কৃষিকাজ জানো না', **৬.** যখন তখন ডেকে যাহাকে কাজের ভার দেওয়া যায় এবং সর্বদা আদেশ পালনের জন্য যে কাছেকাছেই থাকে, **৮.** অহঙ্কার, **১০.** দাবা ইত্যাদি খেলায় বিপক্ষের পরাজয় ('বাজি—'), **১১.** শোভাযাত্রা, **১৩.** স্বর্গগঙ্গা, **১৪.** টিকাকরণের মাধ্যমে সম্প্রতি এই রোগটি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

উপর-নীচ : ১. সম্পত্তি পরিচালক, **২.** ইঙ্গ প্রতিশব্দে রেখা ('— টানা), **৩.** মদন কামদেব, **৫.** বহুমূত্ররোগ, **৭.** নায়কের আচরণ প্রীতিকর হলেও বিরক্তির ভান করে নিবারণার্থ হস্তাদি সঞ্চালন, **৯.** রমণী, স্ত্রী; সাদা সুগন্ধি ফুল বিশেষ, **১০.** 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর সেই বিখ্যাত সংলাপ, 'মাসিমা'— খামু', **১২.** নৌকা।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২৯

মে	জা	জ	■	মে	কু	র	■
ছে	■	নি	দা	ঘ	■	ক	চি
তা	ক	ত	■	বা	ঘ	■	রা
■	ল	■	মো	হ	ন	ভো	গ
শা	হ	জা	হা	ন	■	গা	■
ল্ম	■	ব	ন্ধ	■	অ	স্তি	ম
ল	তা	■	কা	নী	ন	■	লি
■	ল	হ	র	■	ল	বে	দা

সঠিক উত্তরদাতা

শ্যামল রায়
নৈহাটি, নদীয়া
সুশীল কয়াল,
তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৮৩২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ মে ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর সান্নিধ্যে

বিধান চন্দ্র আখুলি

১৯৯৫ সালে কলকাতার প্রণবানন্দ নগরের আর এস এসের প্রথম বিস্তারক হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সময় নগর কার্যবাহ ছিলেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপদা আমাকে প্রথমেই ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর বাড়ি নিয়ে যান। সন্তোষপুর ব্রিজের কাছে ড. ব্রহ্মচারী তাঁর মাকে নিয়ে থাকতেন।

দায়িত্ব নেবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হই। ড. ব্রহ্মচারী ইউনিভারসিটি যাবার আগে এবং পরে প্রতিদিন দু'বার আমাকে দেখতে আসতেন। বিকেলে দীর্ঘ সময় ধরে দেশ, সমাজ, দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে নানান গল্প শুনিয়ে আমার মনের জোর বাড়াবার চেষ্টা করতেন। মেসে এম. টেক, এম.এস.সি-র কয়েকটি ছাত্র ছিল। তারাও ড. ব্রহ্মচারীর আলোচনা মন দিয়ে শুনত এবং নানান প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে পরে সবাই ড. ব্রহ্মচারীর ভক্ত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা যখন ড. ব্রহ্মচারীর সর্বোচ্চ ডিগ্রি, উচ্চতম পদ, অসীম জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবনত, আপ্লুত, তখন ড. ব্রহ্মচারী তাদের অন্য কথা শোনাচ্ছেন। প্রাচীন বেদের সেই বিখ্যাত বাণী— 'ন মেধয়াং ন বহুশ্রুতং'— প্রখর বুদ্ধি, উচ্চ ডিগ্রি বা গভীর জ্ঞান দিয়ে সব কিছু অর্জন করা বা সম্পাদন করা যায় না। আর এস এস-এর প্রচারক ও কার্যকর্তাদের উদাহরণ দিতেন যাঁরা অনেকেই বিশাল মেধা বা জ্ঞানের অধিকারী নন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমন প্রচারক ও কার্যকর্তা অনেক অসাধ্যসাধন করছেন। রাষ্ট্র নির্মাণে সংস্কার ও পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নীরবে নিভৃতে করে চলেছেন।

জ্বর সেরে যাওয়ার পর আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ি তখন ড. ব্রহ্মচারী বিশেষ পরিচর্যার জন্য আমাকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁর বৃদ্ধা মা আমাকে পেয়ে খুবই খুশি হন। আমাকে তিনি নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। ড. ব্রহ্মচারী ইউনিভারসিটি থেকে ফেরার সময় ফলমূল ও পুষ্টিবর্ধক শাকসবজি নিয়ে আসতেন। নিজের হাতে কয়েকটি বিশেষ কবিরাজি রান্না করে খাওয়াতেন। ফল কেটে দিতেন। তাঁর ও তাঁর মায়ের সেই স্নেহ ভালবাসা আমার জীবনের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। তাঁর সাবজেক্ট ছিল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স। তিনি বেশ কিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র ও ডিভাইস উদ্ভাবন করেন, যেগুলি তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, স্টিল প্ল্যান্ট বা বড় বড় কারখানায় প্রয়োজন হয়। এগুলি তৈরির জন্য 'ল্যাকট্রোন' নামে তাঁর একটি কারখানা ছিল। তাঁর এক অধ্যাপক বন্ধু ওই সমস্ত যন্ত্রপাতির পেটেন্ট নেওয়ার কথা বলেন কিন্তু ড. ব্রহ্মচারীর সে বিষয়ে আগ্রহ ছিল না।

ড. ব্রহ্মচারী অনেক গান রচনা করেছেন। দেশাত্মবোধক গান, শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিগীতি, চৈতন্যগীতির অনেক পাণ্ডুলিপি ছড়ানো অবস্থায় তাঁর ঘর থেকে আমি উদ্ধার করি। তার থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের উপর লেখা ১৮টি গান নিয়ে কণ্ঠশিল্পী রুমা মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে একটি ক্যাসেট বের করা হয়। ইস্কনের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ভক্তিচারু প্রভু গানগুলি শুনে অভিভূত হন। তখন ড. ব্রহ্মচারী উৎসাহিত হয়ে ওই গানগুলি ইংরোজিতে অনুবাদ করে সুর দিয়ে দেন। সেরকম একটি পল্লিগীতি হলো— 'এক মনে বাওরে বৈঠা এক মনে বাও।/নদীয়ার পারে যদি পাড়ি দিতে চাও।/ বৈঠা এক মনে বাও।'

ইংরেজিতে— Raw with a single mind with go on rowing/ To reach Mayapur where ganges is flowing/ Where Ganges is flowing.

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলঘরে প্রতি দু' সপ্তাহ অন্তর একটি সভা হোত। ওই সভায় সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হোত। ড. সীতানাথ গোস্বামী, ড. ধনঞ্জয় দাস, ড. প্রীতিমাধব রায়, শ্রীমৎ স্বামী মৃগানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বনাথনন্দজী মহারাজ প্রমুখ জ্ঞানীগুণী মানুষ অংশ নিতেন। ড. ব্রহ্মচারী ওই সভায় নিয়মিত যেতেন এবং বক্তব্য রাখতেন। তাঁর বাচনভঙ্গি সাবলীল না হলেও তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য এবং ক্ষুরধার যুক্তি কেউ খণ্ডন করতে পারতেন না। তাঁর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সর্বদাই অনেক বেশি হোত।

একবার এক ট্যাক্সিওয়ালা ড. ব্রহ্মচারীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সে ইচ্ছে করেই ভুল রাস্তায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনগুণ বেশি পয়সা আদায় করে ছাড়ে। সঙ্গে আমিও ছিলাম। ট্যাক্সির নাম্বার নিয়ে যাদবপুর থানায় যাই। ট্যাক্সিওয়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাই। ও.সি. এফ.আই.আর. লিখতে উদ্যত হন। কিন্তু ড. ব্রহ্মচারী এফ.আই.আর. না করে ট্যাক্সিওয়ালাদের কাউন্সিলিং করার জন্য ও.সি.-র সহযোগিতা চান। থানা থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়। এক রবিবার প্রায় পঁয়ত্রিশ জন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে। নিজের খরচে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। কলকাতা শহর, পশ্চিমবঙ্গ তথা

রাষ্ট্রের সুনাম রক্ষায় ট্যাক্সিচালকদের ভূমিকা যে কতখানি সে বিষয়ে ড. ব্রহ্মচারী হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন। সেদিন ওই ট্যাক্সিচালকও উপস্থিত ছিল এবং ড. ব্রহ্মচারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

একবার সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাঁকুড়ায় আসার সময় তিনি জঙ্গলে আগুন দেখতে পান। যখন উনি জানতে পারেন যে কিছু দায়িত্বহীন লোক মজা করার ছলে এভাবে শুকনো পাতায় আগুন ধরায়, তখন তিনি ইন্টারনেট, বনবিভাগ, স্থানীয়লোক, বনবিভাগের পত্রপত্রিকা থেকে বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং এর ফলে ভারতবর্ষের প্রায় হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, ঔষধীয় গাছ-গাছড়া বিলুপ্ত হচ্ছে তা তুলে ধরেন। ওই শুকনোপাতা দিয়ে কীভাবে কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিক উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

যাদবপুরে সত্যানন্দ দেবায়তনে ড. ব্রহ্মচারীর যাতায়াত ছিল। ভারত সেবাশ্রমের শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বুদ্ধানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী মহারাজ ড. ব্রহ্মচারীকে খুবই স্নেহ করতেন।

আর এস এস-এর সান্নিধ্যে এসে ড. ব্রহ্মচারী দেখেছিলেন সঙ্ঘ পরিচালিত শিশু মন্দির, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিভিন্ন সংস্কার কেন্দ্র, সঙ্ঘের শাখা, সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন কার্যক্রমের সুষ্ঠুপরিচালনা দেখে অবাক হয়েছেন। এর বিপরীত চিত্রটি দেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি অনুষ্ঠানে।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক সম্পদ এবং মানব সম্পদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছিল ড. ব্রহ্মচারীর। তিনি তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও অকাট্য তথ্য দিয়ে সমস্ত বিতর্ক খণ্ডন করে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতেন যে ভারতবর্ষ আগামী দিনে বিশ্বের প্রথম সারিতে যাবে। তখন মেধাসম্পদের যথাযথ প্রয়োগ হবে এবং মেধা সম্পদের সঠিক প্রয়োগ হলেই ভারতবর্ষ সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে। সেইদিন আর বেশি দূরে নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে বহু ছাত্রকে প্রযুক্তি, কারিগরীর শিক্ষা দিতেন। সঙ্ঘের সান্নিধ্য থেকেই তাঁর এই ভাবনা আসে যে এইসব ছাত্রের যদি রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান বা ধারণা না থাকে তাহলে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য জন্মাবে কেমন করে। চাকরি করে বা ডিউটি দিয়ে তারা নিজের বা কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করতে পারলেও দেশ বা সমাজের স্বার্থরক্ষা হবে না। তাই কারিগরী বিদ্যার পাঠ্যসূচির সংস্কারের প্রয়োজন আছে এবং কী ধরনের পাঠ্যসূচি হওয়া দরকার তারও একটি খসড়া তিনি প্রস্তুত করেন।

ড. ব্রহ্মচারী ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। একবার স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের এক অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীর জন্য সমস্ত ছবি তিনি নিজের হাতে এঁকেছেন। কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে বলার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন। একবার শিল্পোদ্যোগী নির্মাণের এক সভায় এক বক্তা ট্রেড সিক্রেট নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক বিখ্যাত কোল্ড ড্রিঙ্কস কোম্পানির ট্রেড সিক্রেট কীভাবে রক্ষা করে তার কাহিনি শোনান। ওই কোল্ড ড্রিঙ্কস তৈরি করার কৌশল কোম্পানির দু'জন লোক অর্ধেক অর্ধেক করে জানেন। ওই দু'জন যাতে কখনো একত্রিত হতে না পারে তার জন্যে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হয়। এমনকী ওই দু'জনকে কখনও এক প্লেনে চড়তে দেওয়া হতো না। এর পরেই ছিল ড. ব্রহ্মচারীর বক্তব্য। তিনি প্রথমেই একটি দামি ব্রান্ডের কফির প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করেন। ওই কফি কোম্পানি একটি হাতিকে কফির ফল খাইয়ে হাতির বিষ্ঠা থেকে কফির বীজ সংগ্রহ করে কফি প্রস্তুত করত,--- যা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ছিল। তাদের এই ট্রেড সিক্রেট অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হতো, এই জন্যেই যে এই কৌশল জেনে গেলে নকল হওয়ার থেকেও বেশি ভয় ছিল খরিদ্দার হারানোর। এর পরেই পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রশংসা করে ড. ব্রহ্মচারী বলেন যে তাঁর কাছে আরও কিছু গোপন তথ্য রয়েছে। ওই কোল্ড ড্রিঙ্কস কোম্পানির যে দুজন ব্যক্তিকে এক প্লেনে চড়তে দেওয়া হয় না, তাদের আলাদা আলাদা ভাবে বিশেষ কিছু ফলের রস ও পানীয় খাওয়ানো হয় এবং বিশেষ সতর্কতায় তাদের দু'জনেরই প্রস্রাব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। তারপর কী হয় তা অবশ্য তাঁর জানা নেই। কিন্তু তারপর যা হলো তা সকলেই চাক্ষুষ করলেন ওই সেমিনারের জলপান সত্রে।

জলপান সত্রে কোল্ড ড্রিঙ্কসে-এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উপস্থিত ডেলিগেটদের প্রায় সবাই কোল্ড ড্রিঙ্কসের মধ্যে প্রস্রাবের গন্ধ পেতে লাগলেন। ফলে সবাই কোল্ড ড্রিঙ্কস বর্জন করলেন। পরে ড. ব্রহ্মচারী আমাদের বলেছিলেন যে কলকাতার রাস্তার ধারের সরবতওয়ালারা এর থেকে অনেক ভাল এবং অনেক বেশি ফর্মূলা জানে। কিন্তু ওই কোম্পানি আমাদের দেশের কয়েকশো বৈজ্ঞানিক, কয়েক হাজার শিল্পপতি, কয়েক লক্ষ বিক্রেতা এবং কয়েক কোটি ক্রেতাকে সে জাদু দিয়ে এইরকম একটা মিথ্যা বিশ্বাস করাতে পেরেছেন এটাই ওদের সব থেকে বড় ট্রেড সিক্রেট।

টিভির বিজ্ঞাপন যা কোটি কোটি দর্শক আগ্রহের সঙ্গে দেখেন। ড. ব্রহ্মচারী বিশেষ বিশেষ কিছু কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞাপনগুলির আকর্ষণীয় উপস্থাপনা শুধুমাত্র পণ্য বিক্রির জন্যে মনে হলেও, এর পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক বিরাট চক্র। এই বিজ্ঞাপন দেখেই কোটি কোটি দর্শক আমাদের সমাজ, সংস্কার, মূল্যবোধ, নীতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেশের যে মূল সামাজিক তথা অর্থনৈতিক শক্তি, 'যৌথ পরিবার' সেগুলি ভেঙে যাচ্ছে। ড. ব্রহ্মচারী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এ বিষয়ে আলোকপাত করে গেছেন।

কালের নিয়মে সকলকেই একদিন জীর্ণদেহ ত্যাগ করতে হয়। ড. ব্রহ্মচারী ইহলোক ত্যাগ করলেও তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে রেখে গেছেন তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি বই, কয়েকশো প্রবন্ধ, কয়েকশো গান, আর হাজার হাজার গুণমুগ্ধ ভক্ত। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি যে তাঁর মতো একজন জ্ঞানী পণ্ডিতের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। তাঁকে জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
8 May - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।